REPLIES TO THE MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সাধারণ প্রশ্নের জবাব

ডা. জাকির নায়েক

ভাষান্তর
হাবিবুর রহমান
এফ.এম, এম.কম.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লেখক : শব্দে শব্দে আল কুরআন

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বংশদ্ভুতরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তারা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ। অতএব তাদের প্রশ্নটি সাধারণ প্রশ্নমালার সাথে যুক্ত হতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নকারী অমুসলিমদের ভুল ধারণা

অনেক অমুসলিম রয়েছেন যারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন। তবে তারা যা পড়েছেন তা সবই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং ইসলামের বই-পুস্তক সমালোচনায় মুখর। এসব অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ বিশটি সাধারণ প্রশ্নের সাথে আরো ভুল ধারণা প্রসূত কিছু প্রশ্ন সংযোজন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তারা আল-কুরআনে পরস্পরে বিরোধী কথা-বার্তা থাকার দাবি করে। তারা আরো দাবি করে যে আল কুরআন অবৈজ্ঞানিক। ইসলামকে যারা উল্লিখিত পক্ষপাত দুষ্ট উৎস থেকে জানার চেষ্টা করেছেন তাদের ভুল ধারণা নিরসনে বিশটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরের সাথে এখানে বাড়তি কিছু সংযোজিত হয়েছে। আমি অবশ্য অমুসলিমদের জন্য অতিরিক্ত আরো বিশটি অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়েছি।

১. বহু বিবাহ

প্রশ্ন : ইসলামে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কেন দেওয়া হয়েছে? অর্থাৎ ইসলামে একাধিক বিবাহের বৈধতা কেন দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : ১. বহু বিবাহের সংজ্ঞা

'বহু বিবাহ' (Polugang) অর্থ এমন এক বিবাহ পদ্ধতি যেখানে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু বিবাহ দু প্রকার হতে পারে। এক প্রকার হলো, (Popwohlod) যেখানে একজন পুরুষ একাধিক মহিলাদের বিবাহ করে। অপরটি হলো যখন একজন মহিলা একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসলামে সীমিত পর্যায়ে 'বহু বিবাহ' অনুমোদিত। অথচ একজন নারীর জন্য একই সাথে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

এবার আমি মূল কথায় আসছি। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার কেন অনুমোদন দিয়েছে?

২. 'আমি কুরআন'-ই পৃথিবীতে একমাত্র ঐশীগ্রন্থ, যে বলে 'একটি মাত্র বিবাহ করো'।

আল-কুরআনই হলো একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে এই মতে এ শব্দগুচ্ছ রয়েছে যে, 'একটি মাত্র বিবাহ করো'। এছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থ এমন নেই যাতে একটি মাত্র

বিবাহ করার নির্দেশ রয়েছে। বেদে এক স্ত্রী গ্রহণ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বা বাইবেল, তালমূদ প্রভৃতি কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও অন্য ধর্মগুলোর পবিত্রগ্রন্থ, যেমন স্ত্রীদের সংখার ব্যাপারে কোনো প্রকার সীমা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় নি। এসব ধর্মগ্রন্থ অনুসারে একজন পুরুষ যত ইচ্ছে বিবাহ করতে পারে। হিন্দু পুরোহিত ও খ্রিস্টান গির্জা অনেক পরে স্ত্রীদের সংখ্যা 'এক'-এ সীমিত করে দিয়েছে।

অনেক হিন্দুধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন অনুসারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। একইভাবে ভগবান স্ত্রী কৃষ্ণেরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল। আগেকার খ্রিষ্টানদের জন্য যত ইচ্ছে স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন ছিল। কেননা বাইবেলে স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে খ্রিস্টান গির্জা স্ত্রীদের সংখ্যা একজনে সীমিত করে দেয়।

ইহুদি ধর্মে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন রয়েছে। তালমুদের বিধান অনুসারে আব্রাহাম অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলেমান অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ)-এর শতাধিক স্ত্রী ছিল। ইহুদি রাব্বী জারসম কেন ইয়াহুদাই পর্যন্ত (৯৬০ খ্রি. থেকে ১০৩০ খ্রি.) বহু বিবাহের এধারা জারী ছিল। অতঃপর তিনি এর বিরুদ্ধে একটি ফরমান জারি করেন।

ইহুদি শেফারডিক সম্প্রদায় যারা মুসলিম দেশসমূহে বসবাস করে তারা বেশির ভাগ বহু বিবাহের এ প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত চালু রাখে। তারপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বী একটি সংশোধনী বিধি জারীর মাধ্যমে একের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করেন।

৩. হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক বহুপত্নীক

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'কমিটি অভ্ দ্য স্ট্যাটাস অভ্ উমেন ইন ইসলাম'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী মুসলমানদের ৬৬ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠায় চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহের হার উল্লিখিত হয়েছে অধিক। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বছরগুলোতে দেখা গেছে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৫.০৬ ভাগ হিন্দু বহুপত্নীক। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ হার শতকরা ৪.৩১ ভাগ। ভারতীয় আইনের বিধান অনুসারে ভারতে কেবল মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী রাখা অর্থাৎ বহু বিবাহ অনুমোদিত। ভারতে কোনো অমুসলিমের একাধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। আগে এ ব্যাপারে সেখানে কোনো বিধি-নিষেধই ছিল না। এমনকি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। ১৯৫৪ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' পাশ করার পর হিন্দুদের

জন্য একের অধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি ঘোষিত হয়। বর্তমান ভারতীয় আইনে একজন হিন্দু পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের বিধান নয়।

এবার চলুন, ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন কেন দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যাক।

৪. আল কুরআন সীমিত 'বহু বিবাহ'-কে অনুমোদন করে

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ভূপৃষ্ঠে আল-কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা বলে, ' কেবল একটি বিবাহ করো।' একথার সমর্থন রয়েছে কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার এ আয়াতে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً .

অর্থ : "তবে বিয়ে করে নাও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের হয় দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত, কিন্তু যদি আশঙ্কা করে যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে (বিয়ে করো)।"

আল-কুরআন নাযিলের আগে বহুবিবাহের কোনো উর্ধ্বতম সংখ্যা ছিল না। অনেক লোক স্ত্রীকে সংখ্যার প্রতিযোগিতা চালাতো, কেউ কেউতো শতাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো। ইসলাম-ই চারজন স্ত্রী রাখার উর্ধ্বতম সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুই, দিন অথবা চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমোদন দেয় এ শর্তে যে, সে (স্বামী) তাদের মধ্যে সুবিচার করতে সমর্থ হবে।

একই অধ্যায় তথা সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ .

অর্থ : "আর তোমরা কখনো স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না ...।"

সুতরাং বহু বিবাহ কোনো বিধিবদ্ধ বিধান নয় বরং একটি ব্যতিক্রম ব্যবস্থা মাত্র। অনেক লোকই এ ভুল ধারণায় রয়েছে যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা একটি বাধ্যতামূলক বিধান।

এটা স্পষ্ট যে, ইসলামে 'করো' বা 'করো না' অর্থাৎ আদেশ নিয়ে এগুলো ৫টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত। যথা :

১. ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় যা বাধ্যতামূলক।

২. মুস্তাহাব অর্থাৎ অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত।

৩. মুবাহ অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য।

৪. মাকরূহ অর্থাৎ অনানুমোদিত বা নিরুৎসাহিত।

৫. হারাম অর্থাৎ বে-আইনি অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

'বহু বিবাহ' এ শ্রেণিবিভাগের মধ্যে মধ্যম অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ বহু বিবাহ ইসলামি বিধান অনুমোদনযোগ্য যা গ্রহণযোগ্য। এটা বলা সঙ্গত হবে না যে, মুসলিমের তিন বা চার জন স্ত্রী আছে, সে তার চেয়ে উত্তম যার একজন স্ত্রী আছে।

৫. পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ু অধিক

প্রকৃতগতভাবে নারী ও পুরুষের জন্ম হার প্রায় সমান। একটি পুরুষ শিশুর চেয়ে একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। একটি নারী শিশু রোগ-জীবাণু ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির বেশি লড়াই করতে পারে। আর এ জন্যই নারীদের তুলনায় শিশু মৃত্যুর হার পুরুষদের মধ্যে বেশি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় নারীদের তুলনায় পুরুষরাই অধিক হারে নিহত হয়। দুর্ঘটনায় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যু বেশি হয়। এসব কারণে পুরুষদের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি এবং কালের যে কোনো যুগে বিপত্নীক পুরুষদের চেয়ে বিধবাদের সংখ্যা অধিক খুঁজে পাওয়া যায়।

৬. ভারতে শিশুর ভ্রূণ নারী হত্যা এবং নারী শিশু হত্যার কারণে পুরুষ জনসংখ্যা নারী জনসংখ্যার চেয়ে অধিক

পরস্পর প্রতিবেশি কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতই একমাত্র রাষ্ট্র যাতে পুরুষের জনসংখ্যা চেয়ে নারী জনসংখ্যা কম। ভারতে উচ্চহারে নারী শিশু হত্যার মধ্যেই এর কারণ নিহীত এবং প্রকৃত সত্য হলো এ দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে দশ লক্ষ নারী শিশুর ভ্রূণ গর্ভপাত করে ফেলা হয়—যদি তা নারী শিশুর ভ্রূণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এ অশুভ প্রবণতা যদি বন্ধ করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, ভারতেও পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে।

৭. বিশ্বে পুরুষ জনসংখ্যার তুলনায় নারী জনসংখ্যা অধিক

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার বেশি। নিউ ইর্য়ক শহরে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা দশ লক্ষ বেশি এবং এ পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আবার সমকামী অর্থাৎ এক কোনো

নারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। সমগ্র আমেরিকাতে ২৫ লক্ষ অর্থাৎ ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি সমকামী রয়েছে। এর অর্থ এ লোকগুলো কোনো নারীকে বিয়ে করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। গ্রেট বৃটেনে পুরুষদের অপেক্ষা ৪০ লক্ষ নারী বেশি রয়েছে। জার্মানিতে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ বেশি। রাশিয়াতে পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ বেশি। সারা বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশি হবে, তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

৮. 'একজন পুরুষের জন্য এক স্ত্রী'— প্রত্যেকের জন্য এমন বিধি আরোপ করা বাস্তব সম্মত নয়

এক পুরুষ কেবল এক স্ত্রী গ্রহণ করলে একমাত্র আমেরিকাতেই তিন কোটি নারীর ভাগ্যে কোনো স্বামী জুটবে না (মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকাতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ সমকামী পুরুষ রয়েছে)। এমনিভাবে গ্রেট বৃটেনে ৪০ লক্ষ জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ নারী উল্লিখিত বিধান জারীর ফলে কোনো স্বামী পাবে না।

মনে করুন, আমার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা মহিলা, অথবা আপনার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা মহিলা। তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে এবং সে হয়তো এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আছে। অথবা সে গণ সম্পদে পরিণত হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো রুচিবান নারী প্রথমটিই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যে পুরুষের এক স্ত্রী রয়েছে, তার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে আপত্তি করবে না।

পশ্চিমা সমাজে এক পুরুষের একাধিক নারীর সম্পর্কে স্থাপন করা একটি সাধারণ ব্যাপার; অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার সেখানে একান্তই স্বাভাবিক। আর এজন্যই সেখানে নারীরা অতৃপ্ত ও যৌন নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করে। অথচ এই একই সমাজ একজন পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপারকে গ্রহণ করতে পারে না; যেখানে হতে পারতো নারী তার সমাজে সম্মানজনক ও মর্যাদার অবস্থানের হতে পারতো অধিকারীরিনী এবং যাপন করতো নিরাপদ জীবন।

যা হোক, যেখানে নারীকে দুটো ব্যবস্থার একটাকে গ্রহণ করতে হবে যে দুটোকে কোনো বিকল্প নেই। হয়তো তাকে একজন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আগে থেকে আছে, অথবা তাকে গণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। এ অবস্থায় ইসলাম নারীকে সম্মানজনক প্রথম ব্যবস্থাটাকেই গ্রহণের অনুমতি দান করে, দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয় না। ইসলাম যে সীমিত 'বহু বিবাহ'-কে অনুমোদন দেয় তার আরো কারণ রয়েছে। তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য নারীর সম্মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করা।

২. একাধিক স্বামী গ্রহণ

প্রশ্ন : একজন পুরুষকে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তখন একজন নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণে ইসলাম বাধা দেয়?

উত্তর : বেশ কিছু লোক যাদের মধ্যে কিছু মুসলিমও রয়েছেন— যারা এ বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, ইসলাম যেখানে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়, সেখানে একজন নারীকে একই অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায় কেন? এখানে বলে নেওয়া আবশ্যক যে, একটি ইসলামি সমাজের ভিত্তি সাম্য ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন তবে সামর্থ্য যোগ্যতা ও দায়িত্বের ভিন্নতা দিয়ে। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয়।

কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার ২২ নং থেকে ২৪ নং আয়াতে ওসব নারীদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে যাদেরকে বিবাহ করা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এরপরে ২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে,

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ -

অন্য পুরুষের বিবাহাধীন স্ত্রী-ও এ নিষেধের তালিকায় রয়েছে।

একজন নারীর একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ কেন নিষিদ্ধ তার কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে ও তাদের পরিবারে জন্ম লাভকারী শিশুর পিতা কে তা চিহ্নিত করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। পিতৃপরিচয় যেমন সহজেই পাওয়া যায় তেমনি মাতৃপরিচয়ও সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকার ক্ষেত্রে সন্তানের মাতৃপরিচয় সহজেই পাওয়া গেলেও পিতৃ পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। মাতা ও পিতা উভয়ের পরিচয়ের ব্যাপারটাতো ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানকালে মনোবিজ্ঞানীরা (prcychologisl) বলেন যে, যেসব শিশু তাদের মাতা-পিতার পরিচয় জানে না তারা তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও হীনমন্যতায় ভোগে। তাদের শিশুকাল কাটে অসুখীভাবে। এ কারণেই দেহপসারিনী বা বেশ্যাদের সন্তানদের শিশুকাল সুখময় হয় না। একাধিক স্বামী গ্রহণকারী নারী গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে গেলে যদি সে নারীকে শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তাকে দুই বা ততোধিক নাম বলতে হবে। আমি জানি যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মাতা ও পিতার উভয়কে সনাক্ত হওয়াটা পরীক্ষার

মাধ্যমে করা সম্ভব। তাই এ পয়েন্টটি অতীতের জন্য প্রযোজ্য হলেও বর্তমানকালের জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

২. প্রকৃতিগতভাবে নারীর চেয়ে পুরুষ হবার ব্যাপারে অধিক যোগ্য।

৩. জৈবিক দিক থেকে একজন পুরুষ তার একাধিক স্ত্রী প্রতি তার কর্তব্য সহজেই পালন করতে পারে। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় স্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন সহজ নয়। একজন নারীকে তার মাসিক ঋতু স্রাবকালীন অবস্থায় ভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কারণ এ সময় তার মধ্যে মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন আসে।

৪. একাধিক স্বামীর স্ত্রীকে একই সাথে কয়েক জনের যৌনশক্তির হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন মারাত্মক রোগের আক্রমণের শিকার হতে পড়ার আশঙ্কা থাকে যা যৌনাচারের মাধ্যমে তার অন্য স্বামীদের মধ্যেও সংক্রমিক হতে পারে। এমন কি যদি তার স্বামীদের অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক না-ও থেকে থাকে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীর স্বামীর জন্য এ জাতীয় সংক্রমণের আশঙ্কা নেই, যদি তার স্ত্রীদের কারো সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক না থাকে।

এখানে উল্লিখিত কারণগুলো একজন লোকও খুব সহজেই চিহ্নিত করতে এবং বুঝতে সক্ষম। এছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে পারে যেজন্য অনন্ত অসীম জ্ঞানের আধারে মহান আল্লাহ নারীদের জন্য একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন।

৩. হিজাব বা নারীর পর্দা

প্রশ্ন : ইসলাম পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে কেন?

উত্তর : সেকুলার তথা ধর্মহীন প্রচারে মাধ্যমগুলোর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল। প্রায়ই ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয় হয়ে থাকে। ইসলামি বিধি বিধান নারী বিগ্রহেরে বড় প্রমাণ হিসেবে প্রায়ই হিজাব বা ইসলামি পোষাককে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নারীর জন্য 'হিজাব' তথা ইসলামি পোশাক প্রবর্তনের পেছনে ধর্মীয় কারণগুলো বিশ্লেষণের আগে ইসলাম সক্রিয় আগমনের পূর্বে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কীরূপ ছিল তা আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ইসলাম পূর্বকালে নারী ছিল অত্যন্ত মূল্যহীন এবং তারা ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো

নিম্নে বর্ণিত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে অনুজ্জ্বল হয়ে উঠবে যে, অতীতের সভ্যতাগুলোতে নারীর মর্যাদা কীরূপ ছিল।

ইসলাম পূর্ব তৎকালীন সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি তাদেরকে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা দিতেও তারা অস্বীকৃত ছিল।

ক. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা : ব্যাবিলনীয় আইনে নারী ছিল নিতান্ত মূল্যহীন। যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী হতো, তা হলে সেই পুরুষের পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো।

খ. গ্রিক সভ্যতা : প্রাচীন সভ্যতগুলোর মধ্যে গ্রিক সভ্যতাকে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত এই গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার নারীর অবস্থায় ছিল অত্যন্ত নিচে এবং সর্বপ্রকার অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো। গ্রিক পুরানো উল্লিখিত 'প্যানডোয়া' নামীয় কাল্পনিক নারীকে মানবজাতির সকল দুর্ভাগ্যের মূল বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রিক জাতি নারীকে অপূর্ণাঙ্গ মানুষ তথা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণি বলে মনে করতো। নারীর সতীত্ব অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এক নারীকে গ্রিকরা দেবীতে আসলে বসিয়ে পূজো করতো। কিন্তু কিছুকাল পরেই তারা আত্মঅহঙ্কারে জমতে উঠে অবাধ যৌনাচার সংস্কৃতিতে তারা ডুবে যায়। এমনকি গ্রিক সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বেশ্যালয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এটা সর্বশ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

গ. রোমান সভ্যতা : রোমান সভ্যতা যখন তার উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল, তখন নারীর প্রতি আচরণ এমন ছিল যে, একজন পুরুষ যখন ইচ্ছে তার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতো। নগ্নতা ও বেশ্যালয়ে যাতায়াত রোমানদের সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

ঘ. মিসরীয় সভ্যতা : মিশরীয় সভ্যতায় নারীকে 'অলক্ষুণে এক শয়তানের চিহ্ন' বলে গণ্য করতো।

ঙ. ইসলাম পূর্ব আরব : আরবে ইসলাম আবির্ভাবের আগে নারীকে তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো এবং নারী শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবিত কবর দেওয়া হতো।

২. ইসলাম নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে এবং তাদেরকে দিয়েছে সাম্য আর আশা যে, তারা তাদের মর্যাদা ধরে রাখবে।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলেছে এবং ১৪ শত বছর আগে তাদের ন্যায় অধিকার দিয়েছে।

পুরুষের জন্য পর্দা : পর্দার আলোচনায় মানুষ সাধারণত নারীদের পর্দার কথাই বলে। যা হোক কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা নারীদের পর্দার কথা আলোচনার আগে সূরা নূরে বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ "(হে নবী!) আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। অবশ্যই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" [সূরা নূর : ৩০]

নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি পড়লে এবং কোনো অসঙ্গত ও নির্লজ্জ চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। সেজন্য তার দৃষ্টিকে অবনত রাখা উচিত।

নারীর জন্য পর্দা : সূরা নূর -এর ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে —

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ .....

অর্থ : "আর (হে নবী!) আপনি মু'মিনাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর সাধারণ প্রকাশিত থাকে তা ছাড়া তাকে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে; আর তারা যেন তাদের চাদর নিজ বুকের উপর জড়িয়ে রাখে এবং তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে। এদের ছাড়া তাদের স্বামী তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর তাদের পুত্র... ।"

৩. 'হিজাব' বা পর্দার ৬টি শর্ত

ক. সীমানা : প্রথম শর্ত হলো দেশের যে সীমা পর্যন্ত তাকাতে হবে তা। নারী ও পুরুষের এ সীমায় পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হলো কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখতে হবে। আর নারীর ক্ষেত্রে এ সীমা হলো কব্জি পর্যন্ত হাত এ মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে

রাখতে হবে। তবে তারা যদি চায় হাত ও মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে পারে। ইসলামি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই হাত ও মুখমণ্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার পক্ষপাতি। তারা এ দুটো অংশকেও 'হিজাব' বা পর্দার আওতাভুক্ত মনে করেন।

বাকি ৫টি শর্ত পুরুষ ও নারীর জন্য সমান

খ. পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, যেন শরীরের কাঠামো প্রকাশ না পায়।

গ. পোশাক এমন স্বচ্ছ বা পাতলা হবে না, যাতে পোশাকের ঢেকে রাখা অংশ দেখা যায়।

ঘ. বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয় এমন জাঁকজমক আকর্ষণীয় পোশাক হবে না।

ঙ. পোশাক বিপরীত লিঙ্গর পোশাকের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ নারী পুরুষের মতো এবং পুরুষ নারীর মতো পোশাক পরতে পারবে না।

চ. পোশাক অবিশ্বাসীদের পোশাকের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ এমন পোশাক পরা যাবে না যা অন্য ধর্মালম্বীদের পরিচয় বহন করে। অথবা যে পোশাক অন্য ধর্মের তথা অবিশ্বাসীদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত এমন পোশাক পরা যাবে না।

৪. ভাব-ভঙ্গির এবং আচার-আচরণও 'হিজাব' বা পর্দার অন্তগত বিষয়ে

পোশাকের ছয়টি শর্তের পাশাপাশি ব্যক্তিকে নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গির ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপরেও পূর্ণাঙ্গ পর্দা নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি পোশাক সংক্রান্ত পর্দার শর্তগুলো পূরণ করে সীমিত অর্থেই পর্দা পালন করলো। পোষাকের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা চিন্তা-চেতনার পর্দা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকতে হবে। এর সাথে ব্যক্তির চলাফেরা, কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ ইত্যাদি শামিল হয়।

৫. 'হিজাব' বা পর্দা উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে

নারীর জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান দেওয়ার কারণ কুরআন মাজীদে সূরা আল-আহযাবের এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে —

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে আপনার কন্যাদেরকে মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন ওড়না নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না। আর আল্লাহতো অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯]

পবিত্র আল কুরআন বলে যে, নারীদের জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান এজন্য দেওয়া হয়েছে তারা যেন সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে নির্যাতিন থেকে রেহাই পাবে।

৬. যমজ দু বোনের দৃষ্টান্ত

ধরে নেওয়া যাক দু বোন যমজ। উভয়ই সমানভাবে সুন্দরী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উভয়ে। তাদের একজন ইসলামি হিজাবে আবৃতা; অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত হাত এবং মুখমন্ডল ছাড়া তার সারা শরীরে ঢাকা। অপর পশ্চিমা পোশাক একটি মিনি স্কার্ট অথবা শর্টস্ পরিহিতা। সামনে রাস্তার ওপারে কয়েকজন বদমাশ ছেলে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। এখন বলুনতো সে কাকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামি 'হিজাব' পরিহিত তাকে, না-কি যে মেয়েটি পশ্চিমা পোশাক মিনি স্কার্ট বা শর্টস্ পরিহিতা তাকে? স্বাভাবিকভাবেই গুণ্ডাটা পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা মেয়েটিকেই উত্যক্ত করবে। এ ধরনের পোশাক পরোক্ষভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি পোশাক পরিহিতার নিজেকে উত্যক্ত করা এবং নির্যাতন করার আমন্ত্রণ বলা যায়। আল কুরআন যথার্থই বলেছে যে, 'হিজাব' নারীকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

৭. ধর্ষকের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ইসলামি শরীয়াহ আইনে কোনো পুরুষ যদি ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং আদালতে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে তার শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। এ কঠিন কথা শুনে অনেকে অবাক হয়ে যান। কেউ কেউ বলেই ফেলেন যে, ইসলাম একটি নিষ্ঠুর এবং বর্বর ধর্ম। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষের কাছে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছি যে, ধরেন আল্লাহ না করুন, কোনো বদমাশ আপনার স্ত্রী, আপনার মাতা বা বোনকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে আসীন। অপরাধীকে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেছে যে, তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। তাদের কেউ কেউ বাড়িয়ে এতোটুকু বলেছেন যে, তারা তাকে নির্যাতন চালিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে কেউ যদি আপনার স্ত্রী বা মাতাকে ধর্ষণ করলে

তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু একই অপরাধ যদি অন্যদের স্ত্রী বা কন্যার উপর সংঘটিত হয়, তখন আপনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে বলবেন বর্বরতা, একই অপরাধ দু রকম বিচার কেন?

৮. নারীকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার পশ্চিমা দাবি একেবারে মিথ্যা

নারীকে স্বাধীনতা দেওয়ার পশ্চিমাদের দাবি মূলত নারীদেরকে পোষণ তার আবার অবমাননা এবং তার সম্মান মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটি ছল ও প্রতারণা ছাড়া কিন্তু নয়। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে, তারা নারীকে উর্ধ্বে উঠিয়েছে। আর বাস্তবতা হলো তারা নারীকে তাদের মর্যাদা থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা ও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছেড়েছে। তার নারীদেরকে বিলাসী পুরুষদের ভোগের উপকরণ যৌন ব্যবসারীদের সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে যা শিল্প সংস্কৃতির রঙিন পর্দা দ্বারা আড়াল করা হয়েছে।

৯. বিশ্বে নারী ধর্ষণের হার আমেরিকাতে সর্বোচ্চ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে মনে করা হয়। অবশ্য বিশ্বের মধ্যে নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ হারও আমেরিকাতে। ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই (F.B.I) রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকাতেই গড়ে দৈনিক ১,০৫৬টি ধর্ষণজনিত অপরাধ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে অন্য একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ১,৯০০ ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। রিপোর্টেটিতে সাল উল্লিখিত হয় নি। তবে সম্ভবত তা ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল হবে। সম্ভত উল্লিখিত বছরগুলোতে আমেরিকানরা আরো অধিক সাহসী হয়ে উঠেছে।

আসুন একটা চিত্রনাট্য অঙ্কন করা যাক। যেখানে দেখা যাবে যে, আমেরিকাতে 'ইসলামি হিজাব' অনুসৃত হচ্ছে। যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে এবং তার মনে কোনো অসৎ অশ্লীল চিন্তা আসতে পারে মনে করে তখনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে। প্রত্যেকটি নারী ইসলামি 'হিজাব' তথা পর্দার বিধান অনুসরণ করছে অর্থাৎ প্রত্যেক নারী মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাস্তার বের হচ্ছে। এর পরেও কোনো অসৎ পুরুষ ইসলামের দণ্ডবিধান অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান তার উপর বলবৎ করা হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এ দৃশ্য পটে যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এমন একটা পরিবেশে আমেরিকাতে ধর্ষণের ঘটনা কি বাড়বে, একই সমান থাকবে, নাকি কমবে?

১০. ইসলামি শরীআহ আইন বলবৎ হলে ধর্ষণের হার অবশ্যই কমে আসবে

ইসলামি শরীআহ আইন কার্যকর হলে তার ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে এবং অপরাধের হার আশাতীতভাবে কমে যাবে। বিশ্বের যে কোনো দেশে ইসলামের

শরীআহ আইন কার্যকর হলে,তা আমেরিকা হোক বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ হোক, সমাজে বসবাসকারীরা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। 'হিজাব' বা পর্দা নারীকে অবমূল্যায়ন করে না বরং নারীকে যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং তার সতীত্ব সম্ভ্রমকে সুরক্ষা করে।

৪. ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে?

প্রশ্ন : ইসলামকে শান্তির ধর্ম কীভাবে বলা যায়, অথচ তা প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে?

উত্তর : কিছু কিছু অমুসলিমের একটি সাধারণ অভিযোগ যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী এতো কোটি কোটি অনুসারী পেতে সক্ষম হতো না, যদি তা শক্তি প্রয়োগ প্রসার লাভ না করতো। নিম্নের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রসার লাভ করে নি। বরং এটা ছিল সত্যের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রভাব, কার্যকারণ ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য যৌক্তিকতা যা ইসলামকে দ্রুত প্রসার লাভে সহায়তা দান করেছে।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দের মূল শব্দ হলো 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এর অপর অর্থ। সুতরাং ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম যা অর্জিত হয় সার্বভৌম স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছের কাছে স্বীয় ইচ্ছেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে।

২. শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয়

এ বিশ্বের সকল মানুষই শান্তি শৃঙ্খলার পক্ষে নয়। এখানে অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের হীন স্বার্থে শান্তি শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই কখনো কখনো শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আর এ সুনির্দিষ্ট কারণেই আমাদের পুলিশ বাহিনী রয়েছে যারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে দুষ্কৃতিকারী ও সমাজ বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহারে করতে বাধ্য হয়। ইসলাম শান্তির প্রয়োজনে সাথে সাথে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেক সময় শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বা শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলামে শুধু শান্তি শৃঙ্খলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার খাতিরেই শক্তি প্রয়োগ করার বৈধতা রয়েছে।

৩. বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসী ও ল্যারী-এর মতামত

ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে– এ ভুল ধারণার উত্তম জবাব দিয়েছেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসী ও ল্যারী (De Laeu o, Leary)। তিনি তাঁর রচিত 'ইসলাম এট দি ক্রস রোড' (Islam at the cross road) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লিখিত অভিযোগের এ জবাব দিয়েছেন–

"অবশেষে ইতিহাসই এটাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। ইসলামকে নিয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামকে তরবারির অগ্রভাগে নিয়ে বিজিত জাতিগুলোকে তা মানাতে বাধ্য করেছে– এ প্রচারণা অনেকগুলোর মধ্যে একটি কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনী যা ইতিহাসবিদগণ বারবার বলে বেড়াচ্ছে।

৪. স্পেনে আটশত বছর মুসলিম শাসন ছিল

মুসলমানরা আটশত বছর স্পেন শাসন করেছে। সেখানে মুসলমানরা কখনো তরবারির সাহায্যে কোনো লোককে ধর্মান্তরিত করে নি। পরবর্তীতে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে আসে এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর সেখানে এমন একজন মুসলমানও বেঁচে ছিল না যে প্রকাশ্যে নামাযের জন্য আযান দিতে পারতো।

৫. এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব মিসরীয় খ্রিষ্টান

মুসলমানরা সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডের ১৪০০ বছর মালিক ছিল। মাঝখানে কয়েক বছর ব্রিটিশ শাসন এবং কয়েক বছর ছিল ফরাসি শাসন। মুসলমানরাই আরব ভূ-খণ্ড শাসন করেছে ১৪০০ বছর। অথচ আজো সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরবীয় খ্রিষ্টান বংশানুক্রমে বসবাস করছে। মুসলমানরা যদি তরবারি তথা শক্তি প্রয়োগ করতো তাহলে সেখানে একজন আরবও খ্রিষ্টান থাকতে পারতো না।

৬. ভারতে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অমুসলিম রয়েছে

মুসলমানরা আনুমানিক এক হাজার বছর ভারত শাসন করেছে। তারা চাইলে এবং তাদেরকে ক্ষমতা ও ছিল ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করতে পারতো। অথচ আজো শতকরা ৮০ ভাগের অধিক অমুসলিম ভারতে বহাল তরিয়তে আছে। এ অমুসলিম ভারতীয়রা আজো সাক্ষী যে, মুসলমনসরা তরবারির জোরে ইসলামকে প্রসারিত করে নি।

৭. ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া

ইন্দেনেশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক মুসলমান বাস করে। মালয়েশিয়ার মেজোরিটি অধিবাসী মুসলমান। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী উল্লিখিত দুটো দেশে গিয়েছিল?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূল

একইভাবে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীর অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। যে কেউ আবার প্রশ্ন ছুঁড়তে পারে যে, ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করে থাকে, তাহলে 'আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী গিয়েছিল?

৯. টমাস কার্লাইল

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ টমাস কার্লাইল তাঁর রচিত 'হিরোজ অ্যান্ড হিরো ওয়ার্শিপ' (Heroes and Hero worship) গ্রন্থে ইসলামের প্রসার লাভ বিভ্রান্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন। "তরবারী! কিন্তু কোথায় তুমি। আমার তরবারি পাবে? সকল মতাদর্শই সূচনায় একজনের সংখ্যালঘু থাকে। মাত্র একজন মানুষের মাথায় তা থাকে। সেখানেই তা থাকে। নিখিল বিশ্বে মাত্র একজনই তা বিশ্বাস করে একক একজন মানুষ সমগ্র মানুষের বিরুদ্ধে। সেই মানুষটি একটি তরবারি নিল এবং তা দ্বারা তার মতাদর্শ প্রচার করার চেষ্টা চালায়। তাতে তার সামান্যতম কাজ হয়েছে কি? তোমার তরবারি তোমার নিজেকেই খুঁজে পেতে হবে। মোটকথা কোনো জিনিস যেমনভাবে সে পারে নিজে নিজেই প্রচারিত হবে।"

১০. দ্বীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই

যে তরবারীর সাহায্যে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে বলে প্রচারণা চালানো হয়। সেই তরবারী যদি কোনো পেয়েও থাকতো তবুও তা সে ব্যবহার করতো না। কেননা কুরআন মাজীদ বলছে−

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

অর্থ : "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তী নেই; নিঃসন্দেহে সত্য সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ভুল পথ থেকে।" [সূরা বাকারা : ২৫৬]

১১. জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি

ইসলাম যে তরবারি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে তা ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি। কুরআন মাজীদের সূরা আন নাহলে বলা হয়েছে−

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : "আপনি মানুষকে আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা বুদ্ধিবৃত্তির এবং উত্তম উপদেশ দানের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বির্তক করুন উত্তম পন্থায়।" [সূরা নাহ্ল : ১২৫]

১২. ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ধর্মসমূহের প্রবৃদ্ধির হার

রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক' তথা বার্ষিক সংখ্যার একটি প্রবন্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের অর্ধ শতাব্দীর [১৯৩৪-৮৪] একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধটি 'প্লেইন ট্রুথ' নামক ম্যাগাজিনেও এসেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধির তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইসলাম। ইসলামের প্রবৃদ্ধির হার তাতে ২৩৫% [শতকরা দু'শত পঁয়ত্রিশ] উল্লিখিত হয়েছে। অথচ খ্রিস্টধর্মের প্রবৃদ্ধির হার তাতে শতকরা ৪৭% ভাগ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ শতাব্দীতে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল যা কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

১৩. আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলাম-ই সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম

আজকাল সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম আমেরিকাতে যেমন ইসলাম তেমনি ইউরোপেও সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম ইসলাম। পাশ্চাত্যের এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে কোন্ তরবারি?

১৪. ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ার্সন

ড. জোসেফ পিয়ার্সন যথার্থই বলেছেন, "যেসব লোক আশঙ্কা করছে যে, আণবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে, তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামি বোমা ইতোমধ্যে বর্ষিত হয়ে গেছে, এটা সেদিনই বর্ষিত হয়েছে যেদিন মুহাম্মদ ﷺ আরবের বুকে জন্মলাভ করেছে।"

৫. মুসলমানরা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী

প্রশ্ন : অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কেন ?

উত্তর : যখনই ধর্ম বিশ্ব সংক্রান্ত কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনা বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের প্রতি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেওয়া হয়। প্রচার মাধ্যমগুলোতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও বিরামহীনভাবে বিভিন্ন ভুল ও মিথ্যা তথ্য সহকারে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে এ ধরনের ভুল তথ্য এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা মুসলমানদেরকে বর্বর ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং অন্য ধর্মানুসারীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে।

আমেরিকার ওকলাহোমায় বোমা বিস্ফোরণের পরে আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলো এ ধরনের মুসলিম বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। অতন্ত দ্রুত তাদের প্রচার মাধ্যমগুলো ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এ আক্রমণের নেপথ্য মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র রয়েছে। অবশেষে আমেরিকার আর্মড ফোর্সের একজন সৈনিক অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

চলুন, 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) এবং 'সন্ত্রাসবাদ' (Terrorism) -এর অভিযোগ দুটো পর্যালোচনা করা যাক।

১. 'মৌলবাদী' শব্দের সংজ্ঞা

'মৌলবাদী' এমন এক ব্যক্তি যে, অনুসরণ ও আনুগত্য করে তার চিন্তা ও বিশ্বাসের মূলনীতির। একজন লোক যদি ডাক্তার হতে চায়, তাকে অবশ্যই ওষুধ সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং ওষুধের মৌলিক কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায় ওষুধের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে। একইভাবে যে গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে চায় তাকে অবশ্যই গণিত শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। বলা যায় যে, তাকে অবশ্যই গণিত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে। যে ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চায় তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে, বুঝতে ও সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে এবং তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে।

২. সকল মৌলবাদী এক রকম নয়

সকল মৌলবাদীর ছবি একই রং তুলিতে আঁকা যাবে না। সকল মৌলবাদীকে তাই একই শ্রেণীতে ফেলে সব মৌলবাদী ভালো বা সব মৌলবাদী মন্দ একথা বলা যাবে না। মৌলবাদীর শ্রেণিবিন্যাস নির্ভর করে কোনো ব্যক্তি যে বিষয়ের ভিত্তিতে 'মৌলবাদী' বলে চিহ্নিত হয়েছে সে বিষয় ও তার কার্যাবলির উপর। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা একজন মৌলবাদী চোর সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ জাতীয় মৌলবাদী সমাজে অনাকাঙ্খিত। অপরদিকে একজন মৌলবাদী ডাক্তার সমাজের জন্য উপকারী। তাই মৌলবাদী ডাক্তার সমাজে কাঙ্খিত এবং সম্মানিত।

৩. আমি একজন 'মুসলিম মৌলবাদী' হতে পেরে গর্বিত। আল্লাহর রহমতে আমি সালামের মূলনীতিসমূহ জানি, বুঝি এবং অনুসরণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করি। একজন সত্যিকার মুসলিম মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে গর্বিত। কেননা আমি জানি ইসলামের মূলনীতিগুলো

বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর। মানবজাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর ইসলামের এমন একটি মূলনীতি নেই। অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের কিছু কিছু শিক্ষাকে তারা অলৌকিক ও অবিচারমূলক বলে মনে করে। এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের অপ্রতুল ও ভুল জ্ঞানের কারণে হয়েছে। একজন মানুষ যদি মুক্তমনে সূক্ষ্মভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃত সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পর্যায়েই মানব কল্যাণের অন্যান্য বিধান।

৪. 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) শব্দের আভিধানিক অর্থ

ওয়েস্টার ডিকশনারি অনুযায়ী 'মৌলবাদ' হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদী খ্রিষ্টানদের একটি আন্দোলনের নাম। এটা ছিল আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া, বাইবেলের অকাট্যতার উপর একটি জোর প্রচেষ্টা। তা শুধু বিশ্বাস ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে নয় বরং সাহিত্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও। এ আন্দোলন বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে 'গড'-এর বাণী বলে বিশ্বাস করার উপর জোর দেয়। যা হোক 'মৌলবাদী' এমন একটি শব্দ যা সূচনায় খ্রিষ্টানদের একটি দলের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যারা বিশ্বাস করতো যে, বাইবেল আক্ষরিক অর্থেই 'গড'-এর বাণী যাতে কোনো ভুল নেই। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে 'ফান্ডামেন্টালিজম' অর্থ যে কোনো ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান ও নীতিমালার কঠোরভাবে মেনে চলা।

অধুনা কোনো লোক ফান্ডামেন্টালিজমে তথা 'মৌলবাদ' শব্দটি উচ্চারণ করলে তার মনে আসে একজন মুসলিমের কথা যে সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত

প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী সেই ব্যক্তি যে সন্ত্রাসের মূল কারণ। ডাকাত যখনই পুলিশকে দেখে, সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সুতরাং পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী। তেমনিভাবে একজন মুসলমানকে সমাজ বিরোধী শক্তি যেমন চোর, ডাকাত ও ধর্ষকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়া কর্তব্য। যখনই উল্লিখিত সমাজ বিরোধী শক্তি একজন মুসলমানকে দেখবে সে যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এটা সত্য যে, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ জনগণের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়। কিন্তু একজন সত্যিকার মুসলিম শুধু কিছু লোকের জন্য যেমন : সমাজ শক্তি যারা জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয় তাদের জন্য। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য একজন মুসলিম সন্ত্রাসী নয়।

সত্যিকার অর্থে সর্বসাধারণ তথা নিরীহ জনসাধারণের জন্য একজন মুসলিম হবে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক।

৬. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে সন্ত্রাসী ও দেশ প্রেমিক ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা যারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থন দেয় নি তাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার 'সন্ত্রাসী' লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল। একই ব্যক্তিদেরকে একই কাজের জন্য ভারতবাসী 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দিত করে। এভাবে একই ব্যক্তিদেরকে একই কার্যাবলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেবেল এঁটে দেওয়া হয়। একপক্ষ তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয় অথচ অপরপক্ষ তাদেরকে 'দেশপ্রেমিক' নামে আখ্যায়িত করে। যারা বিশ্বাস করতো যে, ব্রিটেনের ভারত শাসনের অধিকার আছে তারা এদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়। অপরদিকে যারা মনে করতো যে, বৃটেনের ভারত শাসনের কোনো অধিকার নেই, তারা ওদেরকে আখ্যা দেয় 'দেশপ্রেমিক' ও 'স্বাধীনতা যোদ্ধা'।

কাজেই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য করার আগে তার কথা আগে শুনে নিতে হবে। পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তিই শুনে নিতে হবে। অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য লক্ষ ও তার কার্যাবলির কারণ সামনে রেখে সে অনুসারে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

৭. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'শান্তি'। ইসলাম শান্তির ধর্ম যার মৌলনীতিসমূহ তার অনুসারদের শিক্ষা দেওয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এবং তা বজায় রাখার জন্য কাজ করে যেতে। অতএব প্রত্যেকটি মুসলমানকে মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলনীতিসমূহ তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সমাজ বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যই যে, হবে একজন 'সন্ত্রাসী' তথা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী তাহলেই সমাজে শান্তি ও ন্যায়-ইনসাফ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির ধারাও বজায় থাকবে।

৬. আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন : প্রাণী হত্যা করা একটি নিষ্ঠুর কাজ। মুসলমানরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে কেন?

উত্তর : 'নিরামিষবাদ' (vegetarianism) আজকাল বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন। অনেকে এটাকে পশু অধিকারের সাথে যুক্ত করে। অধিকন্তু বিপুল

সংখ্যক মানুষ মাংস ভক্ষণ ও অন্যান্য আমিষ জাতীয় উৎপাদন সামগ্রী ভোগ ও ব্যবহার করাকে পশু অধিকার লঙ্ঘন বলে সাব্যস্ত করে।

ইসলাম সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নির্দেশ ঘোষণা করে। সাথে সাথে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এ বিশ্ব এবং এ বিশ্বের উদ্ভিদ জগত ও প্রাণিকূল মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন এসব নিয়ামত ও আমানত তথা আল্লাহর দেওয়া সামগ্রী ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ভোগ ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

চলুন এ বিতর্কের আরো কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. একজন মুসলমান বিশুদ্ধ নিরামিষ ভোজী হতে পারে

একজন মুসলিম খাঁটি মুসলমান হয়েও খাঁটি নিরামিষ ভোজী হতে পারেন। আমিষ জাতীয় খাদ্যগ্রহণ একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

২. কুরআন মাজীদ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দান করে

আল কুরআন একজন মুসলমানকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণে অনুমতি দেয়। নিচের আয়াত তার প্রমাণ–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ .

অর্থ : "যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু সেগুলো ছাড়া যা..." [সূরা মায়েদা : ১]

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ .

অর্থ : "আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরো রয়েছে অনেক উপকার এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাকো।"

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ .

অর্থ : "নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে। আর তোমাদের জন্য তাদের

মধ্যে রয়েছে অনেক উপকারিতা এবং তোমরা তাদের ভক্ষণ করে থাকো"। [সূরা মু'মিনুন : ২১]

৩. পুষ্টিকর ও আমিষে পরিপূর্ণ খাদ্য মাংস

আমিষ জাতীয় খাদ্যই প্রোটিনের উত্তম উৎস। এতে জৈবিকভাবেই প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। যেমন ৮টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড যা শরীর দ্বারা পূর্ণ হয় না, তা সুষম খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। মাংসের মধ্যে রয়েছে আয়রন, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন।

৪. মানুষের রয়েছে এক সেট সর্বভূক দাঁত

আপনি যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখে আশ্চর্য হবেন যে, তৃণভোজী প্রাণী, যেমন গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদির দাঁতের বিন্যাস একই রকম, অর্থাৎ এসব পশুর দাঁত ভোঁতা ও সমতল যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী আপনি যদি মাংশাসী প্রাণীদের যেমন সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে ইত্যাদি লক্ষ্য করেন তবে দাঁত লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এসব পশুর দাঁত সুচাঁলো ও ধারালো যা মাংস জাতীয় খাদ্য খাওয়ার উপযোগী। এমনিভাবে আপনি যদি মানুষের দাঁতগুলো লক্ষ্য করেন তাহলে বিস্ময়করভাবে দেখতে পাবেন যে, তাদের দু ধরনের দাঁত রয়েছে। তাঁদের যেমন রয়েছে ভোতা দাত, তেমনি রয়েছে সূঁচানো দাঁত। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। অতএব মানুষের দাঁত সর্বভূক। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন যে, মানবজাতি শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, তাহলে তিনি মানুষকে ধারালো ও সুঁচালো দাঁত কেন দিলেন? এটা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয় যে, তিনি জানেন মানুষকে প্রয়োজনেই নিরামিষ ও আমিষ উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

৫. আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য মানুষ হজম করতে পারে

তৃণভোজী প্রাণীগুলো শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। অপরদিকে মাংসাশী প্রাণীগুলো কেবল মাংস হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ নিরামিষ ও আমিষ উভয় জাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। মানুষের হজম প্রক্রিয়া উভয় ধরনের খাদ্য হজম করতে সক্ষম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি তাই চাইতেন, আমরা শুধু নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে আমিষ নিরামিষ উভয় ধরনের খাদ্য হজম করার শক্তি কেন দিলেন?

৬. হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়

১. অনেক হিন্দু আছেন যারা কার্যৎভাবে নিরামিষ ভোজী। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তারা তাদের ধর্মবিরোধী মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো ধর্মগ্রন্থগুলো আমিষ তথা মাংস ভক্ষণে অনুমতি দেয়। ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে যে, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

২. হিন্দুধর্মের আইনের গ্রন্থ মনু শ্রুতি'র ৫ম অধ্যায় ৩০ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে—

"খাবার গ্রহণকারী যেসব পশুর মাংসই খায় যা খাওয়া যায় তবে এতে সে কোনো মন্দ কিছু করে না। এমনকি যে যদি এটা দিনের পর দিনও করে যায়; কেননা ঈশ্বর-ই কতককে ভক্ষিত হওয়ার জন্য এবং কতককে ভক্ষক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

৩. আবার মনুশ্রুতির একই অধ্যায়ের পরবর্তী ৩১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

"উৎসর্গের শুদ্ধভাবে জন্য মাংস ভক্ষণ যথার্থ এটা ঈশ্বরের বিধান হিসেবে পুরুষ পরম্পরা পরিচিত।"

৪. অতঃপর মনুশ্রুতির ৫ম অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

"ঈশ্বর নিজেই উৎসর্গের উপযোগী পশু সৃষ্টি করেছেন—সুতরাং উৎসর্গের জন্য হত্যা হত্যা নয়।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৮৮ নং অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্টির এবং পিতামহ ভীস্মদেবের মধ্যে শুদ্ধের সময় কি খাদ্য পরিবেশন করলে পিতৃপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করা যাবে—এ সম্পর্কে ও মাতৃগণ যে কথোপকথন হয়েছে তা নিম্নরূপ :

"যুধিষ্ঠির বলল, 'হে মহাশক্তিমান প্রভু, আমাকে বলুন, সেসব জিনিস কী কী—যদি সেগুলো পিতৃপুরুষদের শুদ্ধে উৎসর্গ করলে তারা শান্তি পাবে? কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা স্থায়িত্ব লাভ করবে? আর কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা চিরস্থায়ী হবে?'

ভীস্মদের বললেন, "যুধিষ্ঠির! তুমি আমার কাছে শোনো— যেসব দ্রব্য সামগ্রী ঈঙ্গের জন্য উপযোগী ও যথাযথ এবং যেসব ফল-ফলাদি তার সঙ্গে দিতে হবে। তা হলো সীমের বিচি, চাউল, বার্লি, মালা, পানীয় এক বৃক্ষমূল ও ফলাহার। যদি শ্রাদ্ধের সাথে তার তাহলে হে রাজা পিতৃপুরুষ এ মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। যদি শ্রাদ্ধে মৎস্য উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা দু মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। শ্রাদ্ধ্যানুষ্ঠানে ভেড়ার মাংস পরিবেশন করলে তারা (পিতৃপুরুষগণ) তিন মাসের জন্য সন্তুষ্ট

থাকবে। খরগোশের মাংস দ্বারা চার মাস, ছাগলের মাংস দ্বারা পাঁচ মাস, শূকর মাংস দ্বারা ছয় মাস পাখির মাংস দ্বারা সাত মাস, 'প্রিসাতা' হরিণের মাংস দ্বারা তারা আট মাস পরিতৃপ্ত থাকবে। রুষ্ট হরিণ দ্বারা নয় মাস মাংস দিলে দশ মাস এবং মহিষের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করলে তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় এগারো মাস। গরুর মাংস দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় পুরুষ একটি বছর। ঘি মিশ্রিত পায়েশ পিতৃপুরুষদের কাছে গরুর মাংসের মতোই গ্রহণীয়। ভদ্রিনাশার (এক প্রকার বড় ষাড়) মাংস দ্বারা সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় আর বছর। শুক্ল পক্ষের কোনো দিবসে তাদের মৃত্যু হলে এবং সেই দিবসে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গণ্ডারের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারলে তাদের সন্তুষ্টি অক্ষম হয়ে যায়। 'কালিমতা' নামক সবজি, কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি ও লাল ছাগলের মাংস দিতে পারলেও তাদের সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

অতএব আপনি চান যে, আপনার পিতৃপুরুষদেরকে চিরস্থায়ীভাবে সন্তুষ্টি করতে তাহলে আপনাকে লাল ছাগলের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে হবে।

৭. 'হিন্দুবাদ' অন্যান্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত

যদিও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের অনুসারীদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে তবুও অনেক হিন্দুই নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তার সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছে। কেননা তারা অন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেমন : জৈনধর্ম।

৮. উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে

কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম তাদের খাদ্যনীতিতে নিরামিষবাদকে সংযোজন করে নিয়েছে। কারণ তারা জীবনহত্যার একেবারেই বিরোধী। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রাণী হত্যা ছাড়া জীবন-যাপন করতে পারেন, তাহলে আমিই এ ধরনের জীবন পদ্ধতি গ্রহণকারী ব্যক্তি হবো। আগেকার লোকেরা মনে করতো যে, উদ্ভিদের প্রাণ নেই, তারা প্রাণহীন পদার্থ। কিন্তু আজকাল এটা সার্বজনীন সত্য যে, প্রত্যেকটি উদ্ভিদের প্রাণ আছে। সুতরাং খাঁটি নিরামিষ ভোজী হলেও তাদের জীব হত্যা না করার যুক্তি যথার্থ হয় না।

৯. উদ্ভিদ ব্যথা বেদনা অনুভব করতে পারে

নিরামিষবাদীরা পুনর্যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করতে পারে না। সুতরাং একটি প্রাণী হত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যা লঘু অপরাধ। অধুনা বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে, উদ্ভিদও ব্যথা অনুভব করতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের সেই কান্না মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। এটা এজন্য যে, মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় ২০ হার্টজ থেকে

২০,০০০ হার্টজ-এর বাইরের শব্দ শুনতে সক্ষম। ২০ হার্টস -এর নিচের এবং ২০,০০০ হার্টজ এর উপরের কোনো শব্দ মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। একটি কুকুর ৪০,০০০ হার্টজ পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। তাই কুকুরের জন্য নীরব হুইসেল তৈরি করা হয়েছে যার ফ্রিকোয়েন্সি ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০-এর মধ্যে। এসব হুইসেলের শব্দ একমাত্র কুকুরই শুনতে সক্ষম। মানুষ এর শব্দ শুনতে সক্ষম না। এ হুইসেলের শব্দ শুনে কুকুর তার প্রভুকে চিনে নিতে পারে এবং প্রভুর কাছে ছুটে আসে। আমেরিকার একজন কৃষি খামারের মালিক অনেক গবেষণা করে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে উদ্ভিদের কান্না মানুষের শ্রুতিযোগ্য করে তোলা যায়। সে বুঝে নিতে পারতো উদ্ভিদ কখন পানির জন্য কাঁদে। সর্বশেষ গবেষণার ফল হলো, উদ্ভিদ সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং পারে চিৎকার করে কাঁদতে।

১০. দুই ইন্দ্রিয় বিহীন প্রাণী হত্যা করা কোনো লঘু অপরাধ নয়

একদা নিরামিষ ভোজীরা যুক্তি দিতেন যে, উদ্ভিদের মাত্র দুটো ইন্দ্রিয় আছে, অথচ প্রাণীদের রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে লঘু অপরাধ। ধরা যাক, আপনার এক ভাই জন্ম থেকেই বোবা ও কানা এবং সে অন্য একজন মানুষের চেয়ে দুটো ইন্দ্রিয় কম পেয়েছে। সে যখন বয়োপ্রাপ্ত হলো, তখন এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। এখন বলুন, আপনার ভাইয়ের যেহেতু দুটো ইন্দ্রিয় কম ছিল। আপনি কি বিচারককে অপরাধী সাজা কমিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করবেন? কেননা আপনার ভাইয়ের দুটো ইন্দ্রিয় কম ছিল। প্রকৃত পক্ষে আপনি তখন বিচারককে বলবেন যে, হত্যাকারী একজন মাসুম বা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাই বিচারকের কর্তব্য অপরাধীকে কম শাস্তি দেওয়া।

কুরআন ঘোষণা করেছে —

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا -

অর্থ : "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্য থেকে পবিত্র ও উত্তম জিনিসগুলো খাও।" [সূরা বাকারা : ১৬৮]

১১. গো-মহিষাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি

প্রত্যেকটি মানুষ যদি নিরামিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে গো-মহিষাদীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। যেহেতু তাদের উৎপাদন অত্যন্ত জ্যামিতিক হারে বেড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার্থিব অসীম জ্ঞানের দ্বারা অবগত কীভাবে তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। সুতরাং তিনি আমাদেরকে সঠিক গো-মহিষাদীর মাংস খাওয়ার অনুমতি দান করলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১২. সবাই আমিষভোজী না হওয়ায় মাংসের মূল্য সঙ্গত আছে

কিছু কিছু মানুষ খাঁটি নিরামিষ ভোজী হলেও আমি তাতে কিছু মনে করি না। তবে আমিষ ভোজীদের প্রতি তাদের নির্মমভাবে নিন্দা প্রকাশ উচিত নয়। মূলত যদি সব ভারতীয় আমিষ ভোজী হয়ে যায়, তাহলে বর্তমান আমিষ ভোজীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তখন মাংসের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

৭. পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতি দৃশ্যত অত্যন্ত নির্মম

প্রশ্ন : মুসলমানরা পশুকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে যবেহ করে কেন?

উত্তর : পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতিটি বেশ কিছু সংখ্যাক মানুষের সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নটির উত্তরে দেওয়ার আগে আমি পশু যবেহ সম্পর্কে একজন শিখ ও একজন মুসলিমের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করতে চাই।

একদা একজন শিখ একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করে যে, তোমরা পশুকে গলা কেটে যন্ত্রণা দিয়ে নির্মমভবে কেন যবেহ কর? আমরা তো এক ঝটকায় পশুর গলা কেটে ফেলি। মুসলমান লোকটি উত্তর দিলেন, "আমরা অত্যন্ত সাহসী, তাই সামনে থেকে আক্রমণ চালাই। আমরা 'মরদ কা কাচ্চা'। আর তোমরা কাপুরুষ তাই পেছন থেকে আক্রমণ কর।" এটা নিছক একটা হাস্যরসাত্মক গল্প বটে। তবে ইসলামি যবেহ পদ্ধতি যে শুধু মানবিক তা নয় বরং এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তা নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. পশু যবেহের ইসলামি পদ্ধতি

'যাকাহ' মূল ধাতু থেকে 'যাক্কাইতুম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে যার অর্থ পবিত্রকার। 'তাযকীয়াহ' শব্দটি হলো এর অসমাপিকা ক্রিয়া যার অর্থ পবিত্র করণ।

পশু যবেহের ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করতে এ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—

ক. পশু যবেহের হাতিয়ার (ছুরি) অত্যন্ত ধারালো হতে হবে : পশুকে অত্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যবেহ করতে হবে, যাতে পশুর যন্ত্রণা যথা সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

খ. গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী নালী কেটে ফেলতে হবে : 'যাবীহ' আরবি শব্দ, যার অর্থ যবেহকৃত পশু। পশুর গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের দু পাশের রক্তবাহী নালী কেটে পশুকে যবেহ করতে হবে। পেছন দিকে মেরুদণ্ডের শিরা কাটা যাবে না।

গ. রক্ত বের করে দিতে হবে : মাথা আলাদা করার আগে রক্ত সম্পূর্ণরূপে বের করতে দিতে হবে। এটা এজন্য যে রক্তই হলো যাবতীয় জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির আবাস। এজন্য ঘাড়ের শিরা কোনো ক্রমেই কাটা যাবে না। কারণ হৃদযন্ত্রের দিক থেকে যেসব শিরা-উপশিরা রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেকে যেতে পারে। ফলে মাঝ পথে রক্ত আটকে পতে পারে।

২. রোগ-জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার সহজ পরিবহন মাধ্যম হলো রক্ত

রক্ত হলো রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ ইত্যাদির সহজ পরিবাহন মাধ্যম। সুতরাং ইসলামি যবেহ পদ্ধতি সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত। কেননা রক্তের মধ্যে রোগ-জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত বের করে দেওয়ার ফলে গোশ্ত উল্লিখিত ক্ষতিকর পদার্থ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

৩. গোশত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভালো থাকে

ইসলামি যবেহের মাধ্যমে গোশ্ত দীর্ঘসময় পর্যন্ত সতেজ থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে যবেহের করার ফলে অন্যান্য যবেহ পদ্ধতির চেয়ে গোশতের সাথে রক্তের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে।

৪. পশু ব্যথা অনুভব করে না

অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গলনালীগুলো কেটে দেওয়ার ফলে মস্তিষ্কের স্বায়ুতন্ত্রের সাথে রক্তবাহী শিরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ব্যথার অনুভূতি আর থাকে না। কারণ মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে রক্ত প্রবাহ-ই ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে। মৃত্যুর সময় পশু যে পাগুলো ছুঁড়ে লাফালাফি করে এবং ছটফট করে তা ব্যথার জন্য নয়; বরং তা পেশিগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের কারণে গোশতের মধ্যে রক্তের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং দ্রুতগতিতে রক্ত পশুদেহের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে।

৮. আমিষ জাতীয় খাদ্য মুসলমানদের অত্যন্ত উগ্র করে তোলে

প্রশ্ন : বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, যে যা খায় তার আচরণে সে খাদ্যের প্রভাব পড়ে। অতএব, ইসলাম মুসলমানদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্যের অনুমতি কেন দিয়েছে, যেখানে পশুর গোশত মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তোলে?

উত্তর : ১. ইসলাম কেবল তৃণভোজী পশুর গোশ্ত-ই খাওয়ার অনুমতি দেয়

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, একজন ব্যক্তি যা খায়, তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। এটাই হলো কারণ যে, ইসলাম মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়া

নিষিদ্ধ করেছে। যেমন : সিংহ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত উগ্র ও হিংস্র। সম্ভবত উল্লিখিত পশুর মাংসই মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তুলতে পারে। ইসলাম মুসলমানদেরকে কেবল তৃণভোজী পশুর মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়। যেমন : গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত শান্ত ও পোষমানা। আমরা কেবল শান্ত, নিরীহ ও পোষমানা পশুর গোশতই খেয়ে থাকি। কারণ আমরা শান্তিপ্রিয় ও অহিংস্র।

২. আল কুরআন বলে, হযরত রাসুল (সা) যাবতীয় মন্দ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ ـ

অর্থ : "তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন যাবতীয় অপবিত্র বস্তু।" [সূরা আ'রাফ : ১৫৭]

পবিত্র কালামে আরো ইশরাদ হয়েছে–

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

অর্থ : "আর রাসূল তোমাদের যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" [সূরা হাশর : ৭]

একজন মুসলমানকে কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়ার আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন আর কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়া আল্লাহ অনুমতি দেন নি এ ব্যাপারে রাসূলের বর্ণিত এ বাণীই যথেষ্ট।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসে মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর 'শিকার ও যবেহ' পর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম-এর উল্লিখিত পর্বে ৪৭-৫২ নং হাদীস, সুনানে ইবনে মাজাহ'র ১৩শ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নোক্ত পশুগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। যথা :

ক. তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু অর্থাৎ মাংসাশী হিংস্র পশু। এসব পশু সাধারণত বিড়াল প্রজাতির। যেমন : সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়েনা ইত্যাদি।

খ. তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। যেমন : ইঁদুর নেংটি ইঁদুর, ধারালো নখ বিশিষ্ট খরগোশ ইত্যাদি।

গ. সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। যেমন : সাপ ও কুমীর ইত্যাদি।

ঘ. ধারালো ঠোঁট ও নখ বিশিষ্ট পাখি। যেমন : কাক, চিল, শকুন ও পেঁচা ইত্যাদি।

৯. মুসলমানরা কা'বার পূজো করে

প্রশ্ন : মুসলমানরা মূর্তি পূজার বিরোধী, তবে তারা তাদের সালাত আদায়ের সময় কা'বার পূজা এবং কা'বার সামনে মাথা অবনত করে কেন?

উত্তর : কা'বা হলো কিবলা অর্থাৎ সালাত আদায়ের সময় মুসলমানদের যে দিকে ফিরতে হয়ে, তার দিক নির্দেশক স্থান। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মুসলমানেরা তাদের সালাত আদায়ের সময় যদিও কা'বার দিকে তাদের মুখ ফেরায় কিন্তু তারা কা'বার পূজা করে না। তারা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করে না। কারো সামনে মাথা নত করে না।

কুরআন মাজীদের সুরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

অর্থ : "বারবার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি; কাজেই এমন কিবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিবো, যা আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাও।" [সূরা বাকারা : ১৪৪]

১. ইসলাম ঐক্যকে উৎসাহিত করার নীতিতে বিশ্বাসী

মুসলমানরা যখন তাদের সালাত আদায় করতে চায়। তাহলে তাদের কেউ হয়তো উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করার ইচ্ছে করবে। আবার কেউ হয়তো দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে। সকল মুসলমানকে এক আল্লাহর ইবাদতে চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য– তারা তাদের এক আল্লাহর ইবাদতে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে একই কা'বার দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। যেসব মুসলমান কা'বার পশ্চিম পাশে বাস করে তারা পূর্ব দিকে ফিরে এবং যারা কা'বার পূর্ব পাশে বাস করে তারা পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে কা'বার দক্ষিণের লোকেরা উত্তর দিকে এবং কা'বার উত্তরে লোকেরা দক্ষিণ দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ঐক্য সৃষ্টি হবে।

২. বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থান পৃথিবীতে কেন্দ্রস্থলে

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করে। তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে দক্ষিণ দিক নির্দেশিত উপরের দিকে এবং উত্তর দিকে নির্দেশিত ছিল নিচের দিকে। কা'বা ছিল কেন্দ্রস্থল। অতঃপর পশ্চিমা মানচিত্র অঙ্কন করে উপরের দিককে নিচের দিকে এবং নিচের দিককে উপরেরর দিকে রেখে মানচিত্র অঙ্কন করে। অর্থাৎ তারা উত্তর দিককে উপরের দিকে নির্দেশ করে এবং দক্ষিণ দিককে নিচের দিকে নির্দেশ করে। আল হামদুলিল্লাহ, তা সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল রয়েছে।

৩. কা'বাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশক

মুসলমানরা যখন কা'বা দর্শনে যায়, তখন তারা তাওয়াফ করে অর্থাৎ কা'বাকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এটা বিশ্বাসের প্রতীক এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতীক। যেহেতু প্রত্যেক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি। কাজেই ইবাদাতের যোগ্য সত্তা একমাত্র এক আল্লাহ এটা তারই নিদর্শন।

৪. হযরত উমর (রা)-এর হাদীস

'হাজরে আসওয়াদ' তথা কালো পাথর সম্পর্কে উমর (রা)-এর হাদীস রয়েছে, যাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'আসার' তথা প্রথা-ঐতিহ্য বলা হয়। হযরত উমর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর প্রসিদ্ধ সাথীদের অন্যতম।

সহীহ্ বুখারী ও দ্বিতীয় খন্ড-এর হজ্জ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং ৬৭৫ এ উল্লিখিত আছে যে, উমর (রা) বলেছেন, "আমি জানি, একটি পাথরমাত্র তা পরের কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। আমি যদি রসুলুল্লাহ (সা)-কে তাকে স্পর্শ করতে (এবং চুম্বন করতে) না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তাকে স্পর্শ (এবং চুম্বন) করতাম না।

৫. মানুষ কা'বার উপরে উঠে 'আযান' দিতো

রসুলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় মানুষ কা'বা ঘরের উপরে উঠে আযান দিতো অর্থাৎ সালাতের জন্য আহ্বান জানাতো। যারা অভিযোগ করে যে, মুসলমানরা কা'বার পূজা করে তাদেরকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কোনো মূর্তিপূজক এমন আছে যে, তার পূর্জ্য মূর্তির উপরে উঠে দাঁড়ায়।

১০. মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্ন : পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনাতে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন?

উত্তর : এটা অনস্বীকার্য যে, পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনায় অমুসলিমদের আইনগতভাবে প্রবেশাধিকার নেই। নিচের বিষয়গুলো এ নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য কারণগুলো উদঘাটনে সহায়তা করবে।

১. ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তথা সেনানিবাস অঞ্চলে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার নেই।

আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। তা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আমার প্রবেশাধিকার নেই। যেমন : সেনানিবাস। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নেই। কেবল সেসব নাগরিক যারা দেশের সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত অথবা তারাই সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে ইসলাম সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র মক্কাও মদিনা শহর দুটো হলো– ইসলামের সেনানিবাস এলাকা। এখানে প্রবেশাধিকার তাদেরই থাকা উচিত, যারা ইসলামে বিশ্বাস করে এবং যারা ইসলামকে সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ মুসলমানদের।

একজন সাধারণ নাগরিকের সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশাধিকারে কড়াকড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা অযৌক্তিক। সুতরাং মক্কা ও মদিনায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কোনো অমুসলমানের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করাও সঙ্গত নয়।

২. মক্কা-মদিনায় প্রবেশের ভিসা

ক. কোন লোক যদি বহির্দেশে যেতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে সে দেশের ভিসা তথা সে দেশে প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য আবেদন জানাতে হয়। ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের বেশ কিছু নিজস্ব বিধি বিধান ও শর্তাবলি থাকে, যা পূরণ না হলে ভিসা দেওয়া হয় না।

খ. ভিসার ব্যাপারে যেসব দেশ খুব কড়াকাড়ি করে, তন্মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের নাগরিকের ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে এ কড়াকড়িটা অত্যন্ত বেশি। ভিসা ইস্যুর বেশ কিছু পূর্ব শর্ত তাদের রয়েছে, যা পূরণ সাপেক্ষে ভিসা ইস্যু করা হয়।

গ. আমাকে একবার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যখন সিঙ্গাপুর পৌঁছে তখন দেখি যে, তাদের ইমিগ্রেশন ফরমে লেখা আছে যে, "মাদক দ্রব্য বহনকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড" আমি যদি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে চাই, তাহলে আমাকে তাদের শর্তাবলি

তথা আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাকে একথা বলার অধিকার নেই যে, মৃত্যুদণ্ড একটি বর্বর শাস্তি। আমি যদি তাদের চাহিদা ও শর্তাবলি পূরণ করতে পারি, তাহলেই আমি তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি।

ঘ. যে কোনো মানুষের জন্য মক্কা ও মদিনায় প্রবেশের জন্য পূরণীয় প্রথম শর্ত হলো– তাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' অর্থাৎ তাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল। এটা হলো তার ভিসা পাওয়ার তথা প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য প্রথম পূর্বশর্ত।

১১. শুকর মাংসের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন : শুকরের মাংস ইসলামে নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর : এটা সবাই জানে যে, ইসলামে শুকর খাওয়া নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ নিষিদ্ধতার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করবে :

১. কুরআন মাজীদে শুকর খাওয়া নিষিদ্ধ

কুরআন মাজীদে কমপক্ষে চার জায়গায় শুকরের মাংস ভোগ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হলো : (২ : ১৭৩); (৫ : ৩); (৬ : ১৪৫); এবং (১৬ : ১১৫)।

আরো বলা হয়েছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ۔

অর্থ : "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু... (সূরা মায়েদা : ৩)

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতটিই শুকরের মাংস নিষিদ্ধতার কারণ হিসেবে একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট।

২. বাইবেলেরেরও শুকর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধতা রয়েছে

একজন খ্রিষ্টান এ ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে যথাসম্ভব ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারে। বাইবেলের লেভিটিকাস' গ্রন্থে শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে—

And the swine, though he diede the hoot, and be clover-forted, yet he ckoweth ont the cud, he is unclean to you.

অর্থ : "আর শুকর যদিও তার খুর দু খণ্ডে বিভক্ত এবং খুর বিশিষ্ট পায়ের অধিকারী এবং খাদ্য চিবিয়ে খায় জাবর কাটে না (তবু) ওটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র)।"

of their flesh sholl ye not eat, and their corcans shall ye not touch, the are unclean to you [leviticas 11 : 7-8]

অর্থ : "এগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং এগুলোর মৃতদেহ তুমি কখনো স্পর্শ করবে না, এগুলো তোমার জন্য নোংরা অপবিত্র)।" [লেভিটিকাস ১১ : ৭ :৮)

বাইবেলের 'ডিউটারনমী' গ্রন্থে ও শুকর মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

And the soine because it dividelh the hoolf, yet cheweth not the cud, it is unclean to you, you an shall not eat of their flesh, not touch thoir deed carcass.

"আর শুকর কেননা তার খুর দ্বিখণ্ডিত, যদিও চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, এটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র) এগুলোর মাংস তুমি খাবে না, আর না এগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শ করবে।" [ডিউটারনমি ১৪ : ৮]

বাইবেলের 'ইয়াইয়াহ্' গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ নং শ্লোকে এ একই নিষিদ্ধতা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৩. শুকরের মাংস খাওয়া বেশি কিছু রোগের কারণ

যথার্থ কারণ যুক্তি প্রমাণ ও বিজ্ঞানের মন্তব্য উপস্থাপনের দ্বারা অমুসলিম ও নাস্তিকরা একমত হতে পারে এবং মেনে নিতে পারে যে, একজন ব্যক্তিকে শুকরের মাংস খাওয়া দ্বারা তার অন্তত তা বিভিন্ন মারাত্মক রোগের কারণ হতে পারে। সে বিভিন্ন রকম ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যেমন : গোলাকার ক্রিমি সূঁচালো ক্রিমি, বক্র ক্রিমি ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্রিমি হলো টায়েনিয়া সোলিয়াম (Taenia Solium) বা ফিতাক্রিমি, এটা পেটের ভেতরে অনেক লম্বা হয়ে যায়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে ঢুকে পড়ে এবং শরীরের প্রায় সব অংশেই ছড়িয়ে পড়ে। এটা যদি মস্তিষ্কে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তার স্মৃতিভ্রষ্টের কারণ ঘটে। যদি এটা হৃদযন্ত্রে ঢুকে, তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তবে যদি এটা চোখে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তা অন্ধকারের কারণ হতে পারে। আর লিভারে ঢুকে পড়লে লিভার পঁচে যেতে পারে। মোটকথা ফিতাক্রিমির ডিম শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে পারে। এরপর আছে ভয়ঙ্কর ত্রিচুরা টিচুরসীস' (Trichura tichurasis) শুকর মাংস সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো– এটা যদি ভালো করে রান্না করা হয়, তাহলে এসব ওভা বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়।

আমেরিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ২৪ জন উল্লিখিত রোগীর মধ্যে ২২ জনই শুকর মাংস ভালোভাবে রান্না করে খেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফিতাক্রিমির এ ডিম বা 'ওভা'রান্নার সাধারণ তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয় না।

৪. শুকর মাংস চর্বি তৈরির প্রচুর উপাদান রয়েছে

শুকর মাংস মাংসপেশী তৈরির উপাদান অত্যন্ত কম, কিন্তু চর্বি তৈরির উপাদান অনেক বেশি। এ জাতীয় চর্বিই শিরা-উপশিরায় জমে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপার টেনশন) এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ ঘটায়। এটা আশ্চর্যের কিছু না যে, শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশনে ভোগে।

৫. শুকর পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা প্রাণী

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী হলো শুকর। এ প্রাণীটি নিজেদের বিষ্ঠা মানুষের মল ও অত্যন্ত নোংরা জায়গায় বাস করে। আমার জানামতে আল্লাহ তাআলা এ প্রাণীটিকে উত্তম মেথর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক টয়লেট নেই এবং গ্রামীণ লোকেরা যেখানে খোলা আকাশের নিচে নিজেদের প্রয়োজন সারে, সেখানে শুকর-ই সেগুলো খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, উন্নত দেশগুলোতে আজকাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় শুকুরের প্রতিপালন করা হয়। এসব স্বাস্থ্যসম্মত খামারগুলোতেও শুকরগুলোকে গাদাগাদি করেই রাখা হয়। আপনি তাদেরকে যত পরিচ্ছন্নই রাখতে চান না কেন, এ প্রাণী প্রকৃতিগতভাবেই নোংরা। এগুলো খুব আনন্দের সাথে নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা ও মলমূত্র চোখ নাক দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে থাকে।

৬. শুকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী

শুকর হলো এ পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য নির্লজ্জ প্রাণী। এটাই একমাত্র পশু যা তার স্ত্রীর সাথে সংগম করার জন্য অন্য সঙ্গীদের ডেকে আনে। আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী শুকর মাংস খেতে অভ্যস্ত। যার ফলে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে তারা অপরের সাথে স্ত্রী বদল করে নেয়। অর্থাৎ অনেকের বলে যে" তুমি আমার সাথে ঘুমাও আমি তোমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাই।"

আপনি যদি শুকর মাংস খেতে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনার আচরণও শুকরের মতো হবে। আমরা ভারতীয়রা উন্নত ও রুচিবান হওয়ার জন্য আমেরিকাকে অনুসরণ করি। তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমরা তা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকি। আয়ল্যান্ড ম্যাগজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মর্ম অনুসারে বোম্বের উঁচুস্তরের লোকদের মধ্যে স্ত্রী বদলের এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২. মদপানের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন : ইসলামে মদপান ও এর ব্যবহার কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর : স্মরণাতীতকাল থেকেই মানবজাতির যন্ত্রণার কারণ হিসেবে অ্যালকোহল যা মদকেই দায়ী করা হয়ে আসছে। এটা অগণিত মানুষের দুর্দশার কারণ। এবং অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্বজুড়ে আতঙ্কজনক দুর্দশার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। সমাজে অনেক সমস্যার মূল কারণ হলো মদপান। বিরাজমান পরিসংখ্যানগত দিক থেকে জঘন্য অপরাধের ক্রমবর্ধমান হারে মানসিক রোগীর সংখ্যা এতো প্রবৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ভগ্ন সংখ্যার বিশ্বব্যাপী মদের ধ্বংসযজ্ঞের চাষ প্রমাণ বহন করছে।

১. কুরআন মাজীদে মদের নিষিদ্ধতা

আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মদের ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থ : "ওহে যারা ঈমান এনেছো! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্দেশক তীর-এসব নোংরা অপবিত্র শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা মায়েদা : ৯০]

২. বাইবেলে মদপানের নিষিদ্ধতা

বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে মদপানের নিষিদ্ধতা ঘোষিত হয়েছে :

(a) Wine is a mocker, strong drink is raging and whosover is deceived is not wire.

অর্থ : "মদ হলো প্রতারক, কঠিন পানীয়, যা (মন্দ কাজের উদ্দীপক) যে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো, সে জ্ঞানীর পরিচয় দিল না।" [বাইবেল, নীতিবাক্য ২০ : ১)

(S) and be not drink with wine. মদ্যপান করে মাতাল হয়োনা।" [এসিয়ান্স ৫ : ১৮]

৩. মদপান বিবেকের ভূমিকা পালনে বাধা দেয়

মানুষের মস্তিষ্কে একটি বিবেচনা কেন্দ্র রয়েছে, যাকে আমরা বিবেক বলি। বিবেক মানুষকে এমন কাজ করতে বাধা দেয়, যে কাজকে সে মন্দ বলে মনে করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণত কোনো ব্যক্তি সাঠারণত মাতা-পিতা ও বয়োজৈাষ্ঠদের সম্বোধন করার সময় অশালীন ভাষা ব্যবহার করে না। কারণ তার বিবেক তাকে এটা হতে বাধা দেয়। কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চায় তার বিবেক তাকে জনসমক্ষে এ কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করে, তাই সে টয়লেট তালাশ করে।

আর যখন ব্যক্তি মদপান করে, তখন তার বিবেক স্বয়ং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মদপান কারীকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে যে দেখা যায়। তার মূল কারণ এটাই এমনকি মাতাল ব্যক্তি যখন তার মাতাপিতার সাথে কথা বলে, তখনো সে তাদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করতে থাকে; সে তার ভুল বুঝতে পারে না। ভালো-মন্দ বিবেচনার শক্তি তার লোপ পেয়ে যায়। মাতাল হয়ে অনেকে নিজের পরিধানের পোশাকে পেসাব করে দেয়। মাতাল অবস্থায় সে ভালোভাবে কথা বলতে না হাঁটতে পারে না। এমনকি তারা মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করে।

৪. ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিষিদ মহিলাকে ধর্ষণ এবং এইডস্ ইত্যাদি মদ্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায়

'আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে বুরো অব জ্যাস্টিস' (US, Deprtment of Justice) জরিপ অনুসারে কেবল ১৯৯৬ সালে সেখানে গড়ে প্রতি দিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ধর্ষক এ ঘটনার সময় মাতাল ছিল। নারী উৎপীড়নের ক্ষেত্রে ও একই প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা আট ভাগ আমেরিকান তাদের নিষিদ্ধ আত্মীয়কে ধর্ষণের অভিযোগ অভিযুক্ত। এমনকি এরা মা, বোন কন্যা ও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না অর্থাৎ প্রতি ১২ কি ১৩ জনের একজন নিষিদ্ধ আত্মীয় সাথে ধর্ষণের সাথে জড়িত। এসব ঘটনার প্রায় সবই তাদের একজনের বা উভয়ের মদ পানের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ এইডস্ বিস্তারের প্রধান কারণ মদপান। সুতরাং মদপানই মারাত্মক ও প্রাণঘাতি ব্যাধি।

৫. প্রত্যেক মদপায়ী-ই প্রথম দিকে শখ করে মদপান করে থাকে

মদপানের পক্ষে অনেকেই যুক্তি দেখাতে চান এবং মধপায়ীদেরকে সামাজিক পানকারী বলে চালিয়ে দিতে চান। তারা বলতে চান চা, তারা কোনো পার্টিতে হয়তো এক চুমুক বা দু চুমুক পান করেন এবং তারা কখনো মাতাল হন না। তাদের

নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মদপায়ীই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখিন পানকারী ছিল। একজন মদপায়ীও শুরু থেকে মাতাল হওয়ার জন্য মদপান শুরু করে নি। এমন একজন সৌখিন মদপায়ীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলতে পারে যে, আমি দীর্ঘদিন থেকেই দু-এক পেয়ালা করে মদপান করে এসেছি, কিন্তু আমি কখনো সীমা ছাড়াই নি এবং মাতাল হই নি।

৬. জীবনে কেউ মাতাল হয়ে লজ্জাকর কোনো কাজ করলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে তা যন্ত্রণা দেবে

ধরা যাক একজন সৌখিন মদপায়ী একবার মাত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তখন মাতাল অবস্থায় কোনো নারীকে ধর্ষণ করেছিল, অথবা কোনো নিষিদ্ধ আত্মীয়াকে ধর্ষণ করেছিল। এর জন্য তাকে যদি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে হয় এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে, তবুও একজন স্বাভাবিক মানুষকে এ লজ্জাকর ঘটনার দুঃসহ স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। ধর্ষক এবং ধর্ষিতা উভয়কেই এ অপূরণীয় ও অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হয়।

৭. হাদীসে মদপানের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স) বলেছেন—

ক. সুনানে ইবনে মাজার ভলিউস-৩ মাতলামি' ৩০ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৩৬৭১।

অর্থ : "মদই-হলো সকল মন্দের মা তথা মূল এবং এটা সবচেয়ে লজ্জাকর ও মন্দ।"

খ. উল্লিখিত অধ্যায়ের ৩.৩৯২ নং হাদীসে আছে, "মাদক উৎপাদন করে তার বেশি পরিমাণ যেমন নিষিদ্ধ, তার কম পরিমাণও নিষিদ্ধ।"

সুতরাং এক ঢোক বা এক ড্রাম কোনোটাই ক্ষমাযোগ্য নয়।

গ. শুধু মদ পানকারীর উপরই আল্লাহর লানত তথা অভিশাপ নয়; বরং যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করে, তাদের উপরও আল্লাহর অভিশাপ। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

অর্থ : "দশ শ্রেণীর লোকের উপর আল্লাহর অভিশাপ যারা মদের সাথে জড়িত।

১. যারা চোলাই করে ২. যার জন্য মন্দ চোলাই করা হয় ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে ৫. যার জন্য মদ বহন করে নেয়া হবে ৬. যে মদ পরিবেশন করে, ৭. যে মদ বিক্রয় করে, ৮. যে মদ বিক্রিত টাকা ব্যবহার করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে এবং ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

৮. মদপানের সাথে যেসব রোগ জড়িত

মদপান নিষিদ্ধ করার পেছনে বেশকিছু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। পৃথিবীতে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্যু মদপানের সাথে

সম্পর্কিত। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদপানের কারণে অকালে ঝরে যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা, এর কুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবহিত। নিম্নে মদপান জনিত কারণে যেসব রোগ হয়, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো—

১. লিভার সিরোসীস, যাতে কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়।

২. বিভিন্ন ধরনের ক্ষতরোগ বা ক্যান্সার অম্ননালীর ক্যান্সার, মস্তিষ্কে ক্ষতজনিত প্রদাহ, গলার অভ্যন্তরে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার (Hepatoma),মল-নালীর ক্যান্সার ইত্যাদি।

৩. অন্ননালী কণ্ঠনালী, পাকস্থলির প্রদাহ, হজমি শক্তি কমে যাওয়া 'যকৃতের প্রদাহ ইত্যাদি রোগ মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

৪. হৃদযন্ত্রের যাবতীয় রোগ যেমন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, হৃদকম্পন, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির সাথে মদপানের সম্পর্ক রয়েছে।

৫. হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন নালীর যাবতীয় রোগ যে জন্য হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফিট হয়ে যাওয়া ও গলনালীর প্রদাহ ইত্যাদিও অধিকাংশ মদপান জনিত কারণে হয়ে থাকে।

৬. বিভিন্ন প্রকার প্যারালাইসিসের অধিকাংশ মদপানের প্রতিক্রিয়ার হয়ে থাকে।

৭. মস্তিষ্কের যাবতীয় জটিল রোগ এবং স্নায়ুর যাবতীয় রোগ অধিকাংশই মদপানের কুফল।

৮. বেরিবেরি এবং শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদানের শূন্যতাজনিত অনেক রোগই মদপানের ফলে হয়ে থাকে।

৯. যাবতীয় চর্মরোগ মদপানের ফলে হয়ে থাকে

[মদপানের কারণে আরো যেসব রোগের উৎপত্তি হয়, সেসব রোগের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। এছাড়া এসব রোগের নাম বাংলায় ভাষান্তর করতে হলে প্রত্যেক রোগের পরিচয় দিতে টীকা সংযোজন করতে হবে। যার ফলে বইয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে বিধায় এখানে সমাপ্ত করা হলো। — অনুবাদক]

১০. মাদকাসক্তি স্বয়ং একটি রোগ

চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ মদপানকে আর মাদকাসক্তি না বলে এটাকে স্বয়ং একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্প্রতি একটি প্রচারপত্রে উল্লেখ করেছে যে, মদ যদি একটি রোগই হয়ে থাকে, তবে এটাই একমাত্র রোগ যায়—

১. বোতলের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

২. পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও ও টেলিভিশনে যার প্রচার করা হয়।

৩. যার প্রচার-প্রসারের জন্য শুল্ক নিয়ে লাইসেন্স পারমিট দেওয়া হয়।

৪. যার মাধ্যমে সরকার রাজস্ব লাভ করে।

৫. যার মাধ্যমে রাজপথে মৃত্যুর আগমন হয়।

৬. যার কারণে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং অপরাধ বাড়ে।

৭. যার কোনো জীবাণু নেই অথবা আনুষঙ্গিক কারণ নেই।

মাদকাশক্তি কোনো রোগ নয়— এটা শয়তানের কারসাজী।

মহান আল্লাহ যিনি অনন্ত জ্ঞানের মালিক, তিনি শয়তানের এই লোভনীয় ফাঁদ থেকে আমাদেরকে সর্তক করে দিয়েছেন। ইসলামকে 'দীনুল ফিতরাহ' তথা মানুষের জন্য স্বভাবসম্মত জীবন-ব্যবস্থা বলা হয়েছে। ইসলামের যাবতীয় বিধি নিষেধ মানব কল্যাণের লক্ষ্যেই প্রদত্ত হয়েছে। যাতে করে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিক অবস্থান সংরক্ষিত থাকে। মদপান হলো মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। এটা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, একটি সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। মদপান মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। অথচ মানুষের দাবি হলো তারা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আর এজন্যই ইসলামে মদ পানকে হারাম তথা নিষিদ্ধ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

১৩. নর-নারীর সাক্ষ্যের সমতা

প্রশ্ন : দু জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান কেন?

উত্তর : দু জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান –এটা সত্য নয়। তবে এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা সত্য। আল-কুরআনের ন্যূনপক্ষে ৫টি আয়াতে নারী-পুরুষ কারো উল্লেখ ব্যতীত সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। তার মধ্যে একটি মাত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু জন নারীর সাক্ষের সমান। আর তা হলো সূরা আল বাকারার ২৮১ নং আয়াত। এটা কুরআন মাজীদের দীর্ঘতম আয়াত। এতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ .

ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ......

অর্থ : "ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদের কর। তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ তাকে লেখতে শিখিয়েছেন; সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে আর তাতে যেন বিন্দুমাত্র কম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন অভিভাবক লেখার বিষয়বস্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে বলে দেয়। আর দুজন সাক্ষী রাখবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে তবে যদি দু জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু জন মহিলা এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, তাদের একজন ভুল করলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে। [সূরা বাকারা : ২৮২]

কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একটি লিখিত চুক্তি করার জন্য দু পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দু জন সাক্ষী রাখার নির্দেশ ও দান করা হয়েছে। এতে সাক্ষী দু জন পুরুষ হওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যদি দু জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু জন নারী সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো লোক কোনো বিশেষ অসুবিধার জন্য অপারেশন করাতে ইচ্ছে করল। তার চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সে দু জন অভিজ্ঞ সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কিন্তু কোনো কারণে সে যদি দু জন সার্জন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন সে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন অভিজ্ঞ সার্জনের সাথে দু'জনের সাধারণ এম. বি. বি. এস. ডাক্তারের পরামর্শ নেবে।

একইভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও দু জন পুরুষ সাক্ষীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলাম আশা করে যে, নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করবে। যেহেতু অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করে থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিক দক্ষ। এটাই আশা করা হয়ে থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাক্ষী হিসেবে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে নারীদের একজন যদি ভুল করে অন্যজন যেন তাকে স্মরণ করে দিতে পারে। কুরআন মাজীদে এক্ষেত্রে 'তাজিল্ল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তাল পাকিয়ে ফেলা বা ভুল করা। অনেকে এ শব্দের ভুল অর্থ করে যে, এর অর্থ ভুলে যাওয়া। সুতরাং একমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই একজন পুরুষের সাক্ষীকে দু জন নারীর সাক্ষ্যের সমতুল্য করা হয়েছে।

যা হোক, ইসলামি আইনে কতেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও নারীসুলভ দুর্বলতা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। নারীরা তাদের আবেগপ্রবণতার জন্য হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সংশয়িত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞগণ হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান দু জন নারী-রায় দিয়েছেন। এছাড়া অন্য সকল মামলায় একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। কুরআন মাজীদে পাঁচ স্থানে পুরুষ নারী-কোনটা উল্লেখ না করে সাক্ষ্যদানের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উইল প্রস্তুত কালে দুজন ন্যায়বান ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা আবশ্যক। সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ......

অর্থ : "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।" [সূরা মায়েদা : ১০৬]

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ - وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ - ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ -

অর্থ : "আর তোমাদের মধ্য থেকে দু জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখবে; এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সার্বিক সাক্ষ্য দেবে।" [সূরা তালাক : ২]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ -

অর্থ : "আর যারা কোনো সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই প্রকৃত ফাসিক।" [সূরা নূর : ৪]

বেশ কিছু ইসলামি বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু জন স্ত্রী লোকের সমান এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য এ মতামত সকলে সমর্থন করেন না। কারণ কুরআন মাজীদের সূরা নূরের একটি আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। যেমন বলা হয়েছে—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ -

অর্থ : "আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তখন সে আল্লাহর নামে চার বার কসম করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।" [সূরা নূর : ৬]

হযরত আয়েশা (রা) এর মতে, একেক সাক্ষী হাদীসের বিশুদ্ধ তাতে গ্রহণযোগ্য

ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ভেবে দেখুন ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি রোযা। সেই রোযার ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষ্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন সাক্ষী এবং রমযানের শেষে ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুজন সাক্ষী প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের পুরুষ বা না নারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য অগ্রপণ্য, সেক্ষেত্রে কোনো পুরুষ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষকরে যখন সমস্যা মহিলাদের হয়ে থাকে। যেমন : কোনো মহিলার মৃতদেহের গোসল দেওয়ার সাক্ষ্য একজন নারীর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।

অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাম্যের ব্যাপারে যে ইসলামে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা লিঙ্গ বৈষম্যের জন্যে নয়; বরং তা সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকা পার্থক্যে কারণে।

১৪. উত্তরাধিকার আইন

প্রশ্ন : মীরাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন?

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যথার্থ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাসি সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

আল-কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮০, ২. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪০, ৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭—৯, ৪. সূরা নিসা, আয়াত ১৯, ৫. সূরা নিসা, আয়াত ৩৩, ৬. সূরা আল মায়েদা , আয়াত ১০৬—১০৮

নিম্নোক্ত তিনটি আয়াতে আত্মীয়দের অংশ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ - وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ - فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ - آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করেন : এক পুত্রের অংশ দু কন্যার সমান; তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দু জনের অধিক তা

হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু ভাগ। আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেক পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আরে যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা মাতাই ওয়ারিস হয় তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ; কিন্তু যদি তার ভাই বোন থাকে, তবে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ–এসবই মৃত ব্যক্তি যে অসীয়ত করে গেছে তা দেওয়ার পরে ও ঋন পরিশোধ করার পরে। তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা জানোনা— এ ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ হিকমতওয়ালা।"

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ - وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ - وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ - وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ -

অর্থ : "আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, তবে যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে ওরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে—তোমরা যে অসীয়ত করবে, তা দেওয়া ও ঋণ পরিশোধ বরার পরে, যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, এ অবস্থায় যে, তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা এক

বেপিত্রেয় তার কোনো উত্তরাধিকারী, তবে তারা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ; কিন্তু তারা যদি এর অধিক হয়, তবে তারা তিনভাগের একভাগ সমান অংশীদার হবে তার অসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধ করার পর। অসীয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়, এটা আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"

পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يَسْتَفْتُونَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ - إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ - وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ - وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ - يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا - وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

অর্থ : "তারা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়, আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন 'কালালা' (পিতৃমাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্পর্কে— যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় (তার পিতা-মাতাও না থাকে) এবং তার এক বোন থাকে, তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধংশ পাবে। আর যদি সে সন্তানহীনা হয়, তবে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। তবে যদি কোনো দু জন থাকে, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন কয়েকজন থাকে, তবে একপুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহ কার্য বিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সূরা নিসা : ১৭৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী তার বিপক্ষ পুরুষের তুলনায় মীরাসি সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে থাকে। তবে এটা সকল ক্ষেত্রেই নয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তান বিহীন হয়ে থাকে এবং তার মাত্র একটি বৈপিত্রেয় ভাই ও একটি বৈশিত্রের বোন হাকে। তবে তারা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পাবে। যদি মৃতের পুত্র-কন্যা থাকে, তবে মাতা-পিতা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুসের দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়। মৃত ব্যক্তি যদি এমন নারী হয়ে থাকে যার পুত্র কন্যা ভাই-বোন কেউ না থাকে, শুধু স্বামী ও মাতাপিতা থাকে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে সম্পত্তির অর্ধেক সম্পত্তি, মা পাবে তিন ভাগের একভাগ ও বাবা

পাবে ছয় ভাগের একভাগ। এক্ষেত্রে নারী তার পুরুষ প্রতিপক্ষ তথা পিতার চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পাবে। এটা সত্য যে, সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মীরাস পায়। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত বিধানই কার্যকর।

ক. পুত্রসন্তান যা পায় কন্যা তার অর্ধেক পায়।

খ. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী পায় আট ভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তি নারী হলে সন্তান না থাকা অবস্থায় স্বামী পার চার ভাগের এক ভাগ।

গ. মৃতের সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং স্বামী পায় দু ভাগের এক ভাগ।

ঘ. মৃতের যদি মাতা-পিতা ও সন্তান না থাকে, তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

ইসলামে নারীর উপর এমন কোনো অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও দায়-দায়িত্ব নেই, যা ন্যস্ত আছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের আগে নারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সব কিছুর দায়িত্ব থাকে পিতা ও ভাইদের উপর। বিয়ের পরে উপরিউক্ত দায়িত্ব বর্তায় স্বামী এবং ছেলেদের উপর। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়-দায়িত্ব পূরণ তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য তাকে উত্তরাধিকারের অংশ দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন : এক ব্যক্তি তার এক ছেলে ও এক মেয়ের জন এক লক্ষ্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে মারা গেল এ অবস্থায় ছেলে পাবে এক লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের সর্বপ্রকার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুত্রের উপর ন্যস্ত।

অতএব দেখা গেলো সেসব প্রয়োজন পূরণে তার প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে যায়। ধরা যাক, তার এক লক্ষ টাকার মধ্যে আশি হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল, তাহলে বাকী থাকল বিশ হাজার টাকা। ফলে দেখা গেল যে, ছেলে এক লক্ষ টাকা পেয়েও তার টিকল মাত্র বিশ হাজার টাকা। অপরদিকে মেয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে কোনো খরচ না থাকাতে পঞ্চাশ হাজার টাকাই গচ্ছিত থেকে গেল। কেননা তার এ টাকা থেকে কারো জন্য একটি টাকাও ব্যয় করতে হলো না। এখন যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, একদিকে এক লক্ষ টাকা যার আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে, আর অপরদিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যার একটি পয়সা ও খরচ হবে না। আপনি কোনটা নেবেন? তাহলে কোনো বোকাও এক লক্ষ টাকা নিতে চাইবে না।

১৫. আল কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা?

প্রশ্ন : আল কুরআন যে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ কী?

উত্তর : ১. আল কুরআন সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস

১৪০০ বছর আগে যখন আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়, তখনই মুসলিম বিশ্বে হিদায়াতের আলো জ্বলে উঠেছিল। মুসলমানদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ এই যে, আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মত পার্থক্যও নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, আল কুরআনই ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছে এবং এর হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ এ কিতাবকে সংরক্ষণ করবেন। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের যত লোক দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হিসেবে বিধানই প্রযোজ্য।

২. মুহাম্মদ (সা) বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ

মুহাম্মদ (সা) মানবজাতির প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমতস্বরূপ। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।" (আল কুরআন : ১০৭)

হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল। তাই তাঁর বাণী ও চিরস্থায়ী। অতএব তাঁকে প্রদত্ত মুজিযা তথা অলৌকিক বিষয়গুলো চিরস্থায়ী এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এগুলোর কার্যকারিতা থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত অনেক অলৌকিক বিষয় বা ঘটনাবলি রয়েছে, যাতে মুসলমানরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৩. আল কুরআন হলো শ্রেষ্ঠ মুজিযা

আল কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা)-কে চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ মুজিযা আল কুরআন সর্বকালের জন্যই এক অনন্য মুজিযা। তাই এটাকে 'মুজিয়ার মুজেয়া বলা যায়। আর এটা প্রমাণিত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

৪. কুরআনের উৎসের দিক থেকে তিনটি ধারণা ও তার পরীক্ষা

ক. মুহাম্মদ (সা) সচেতন, অর্ধসচেতন বা অবচেতন অবস্থায় নিজেই রচনা করেছেন। মুহাম্মাদ (সা) কখনো এ দাবী করেন নি যে, আল-কুরআন তাঁর নিজের রচিত। তিনি সর্বদা এটাই বলেছেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী। তাঁর

একথা অবিশ্বাস করার অর্থ (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একটি মিথ্যা ও বলেন নি। তাঁকে মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে 'আল-আমীন' অর্থাৎ 'তথা বিশ্বাসী' উপাধি দিয়েছিল। সমসাময়িক সকল মানুষ তাঁকে একজন সৎ, আমানতদার ও সৎচরিত্রের অধিকারী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বলেই জানতো। অথচ নবুয়ত লাভের পর একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে। এ অবস্থায় ও তাদের সকল মূল্যবান অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছেই জমা রাখতো। অতএব এমন একজন মানুষ আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং তিনি একজন নবী এ মিথ্যা দাবী করতে পারেন না।

দুনিয়াবি স্বার্থে অনেক লোকই নিজেকে সাধক পুরুষ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা প্রচারক হিসেবে দাবী করে এবং বিপুল সম্পদ অর্জন করে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। যেমন– ভারতে ও এরূপ লোকের সমাগম দেখা যায়। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) নবুয়ত লাভের আগে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক স্বচ্ছল ছিলেন। তিনি নবুয়ত লাভের ১৫ বছর আগে 'খাদীজা' নাম্নী এক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করেন। অথচ নবুয়ত লাভের পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলে নি। কেননা তাঁর ঘরে রান্না করার মতো কিছু ছিল না। তাঁরা পানি ও খেজুর এবং মদীনাবাসীদের দেয়া দুধ খেয়ে জীবন-যাপন করতেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন চিত্র। হযরত বিলাল (রা) যিনি তাঁর ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন, তিনি বলেন নবী করীম (সা) যখনই কোনো দিক থেকে হাদীয়া স্বরূপ কিছু পেতেন, তা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং কখনো নিজের জন্য রেখে দিতেন না। তাঁর এ জীবন চিত্র থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বস্তুগত স্বার্থে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন না। অতএব আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা তাঁর উপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, তার এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ঘোষনা করেছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থ : "সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য পেতে পারে;

কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা উপার্জন করেছে তার জন্যও।" (সূরা আল বাকারা : ৭৯)

এ আয়াতে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে যারা নিজ স্বার্থে নিজে কিতাব রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়। অতএব আল কুরআন মুহাম্মদ (সা) নিজে রচনা করেনে নি; বরং এটা আল্লাহর বাণী, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর উপর নাযিল করেছেন।

খ. মুহাম্মাদ (সা) কোনো মানুষ থেকে বা কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে আল-কুরআন লাভ করেছেন? আল-কুরআন সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা হলো মুহাম্মাদ (সা) এটা অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে নকল করেছেন। অথবা এটা অন্য কোনো মানুষ থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি বিষয় বিবেচনা করলেই এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। পবিত্র কুরআনেও এর সাক্ষ্য রয়েছে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

অর্থ : "আর আপনিতো আগে আর কোনো কিতাব পাঠ করেন নি, এবং নিজের ডান হাত দিয়ে কোনো কিতাব লিখেননি, যাতে অসত্যপন্থীরা কিছু মাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পরে। (সূরা আনকাবূত : ৪৮)

অতএব এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল কুরআন অন্য কোনো উৎস তথা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো মানব উৎস থেকে সংগৃহীত নয়; বরং এটা আল্লাহর বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূল মহাম্মাদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন ওহীর মাধ্যমে।

আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

الٓمّٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : "আলিফ, লাম, মীম" এ কিতাব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এতে কোনে সন্দেহ নেই। তারা কি বলে যে, এটাতো সে নিজে রচনা

করে নিয়েছে? বরং এটাতো আপনার রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য। যেন আপনি এমন লোকদের সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা সৎপথ পেয়ে যাবে।" (আল কুরআন ৩২ ঃ ১-৩)

গ. আল কুরআন মানব রচিত নয়– এটা আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর বাণী : আল-কুরআনের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় এবং সঠিক ধারণা হলো এটা কোনো মানুষ রচনা করেনি; বরং এটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক ও মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

[কুরআন মাজীদ যে, আল্লাহর বাণী সে সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর সে আলোচনা Is the Quran Gods সবার নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় যা 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো। – অনুবাদক।

১৬. আখিরাত–তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন : আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী কোন জীবন আছে, তার প্রমাণ কী?

উত্তর : ১. মৃত্যুর পরে জীবন আছে তা অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়

অনেক মানুষ আশ্চার্য বোধ করে যে, এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুগে একজন সচেতন মানুষ কিভাবে মৃত্যুর পরে আর একটি জীবন আছে'—একথা বিশ্বাস করতে পারে? আখিরাত অবিশ্বাসীরা মনে করে, যারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যই অন্ধভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে। তবে আমার আখিরাত বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অন্ধবিশ্বাস নয়।

২. আখিরাত একটি যুক্তিনির্ভর বিশ্বাস

আল-কুরআনের এক হাজারের অধিক আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদী বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। (এ বিষয়ে আমার রচিত' কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টব্য) কুরআনে বর্ণিত অনেক সত্যই গত কয়েক শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি যে, কুরআন বর্ণিত সব বিষয়ই সত্য বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

ধরা যাক, কুরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের শতকরা ৮০ ভাগ ১০০% ভাগ সত্য বলে প্রমাণিত। বাকি ২০ ভাগ সম্পর্কে বিজ্ঞানের এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য নেই।

কারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সে পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় নি যাতে যেসব বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়। অতএব সেই ২০ ভাগ-এর একটি আয়াত সম্পর্কে ও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে, আমরা তা মিথ্যা একথা বলতে পারিনা। সুতরাং কুরআনের শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ সত্য বলে প্রমাণিত এবং বাকি ২০ ভাগ এখনো অপ্রমাণিত, সেখানে যুক্তি বলে যে, সেই ২০ ভাগও সত্য। আখিরাত তথা পরকালের অস্তিত্ব ও সেই ২০ ভাগের অন্তর্গত একটি সত্য, যা যুক্তির নিরিখে সত্য হলেই প্রমাণিত হবে।

৩. শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধসমূহের ধারণা পরকালের ধারণা ছাড়া অর্থহীন

ডাকাতি করা ভালো কাজ না মন্দ কাজ? এ প্রশ্নের জবাব একজন সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ মানুষও বলবে যে, এটা মন্দ কাজ। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তেমন এক ব্যক্তি একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে 'ডাকাতি মন্দ কাজ' একথা কেমন করে বোঝাতে সক্ষম হবে?

মনে করুন, আমি বিশ্বের মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। একই সাথে আমি একজন বুদ্ধিমান ও যুক্তিতে বিশ্বাসী একজন মানুষও বটে। আমি বলি যে, ডাকাতি একটি ভালো কাজ। কারণ এটা আমাকে বিলাসী জীবন-যাপনে সাহায্য করে। সুতরাং ডাকাতি আমার জন্য ভাল কাজ।

কেউ যদি আমার সামনে ডাকাতি আমার জন্য মন্দ হওয়ার পক্ষে একটি যুক্তি ও পেশ পারে, আমি তা হলে ডাকাতি সাথে সাথে ছেড়ে দিবো। মানুষ সাধারণত যেসব যুক্তি পেশ করে থাকে, সেগুলো হলো—

ক. যার সম্পদ ডাকাতি হয়ে গেছে সে সমস্যার সম্মুখীন হবে

কেউ হয়ত যুক্তি দেবে যে, যার ডাকাতি হয়ে গেছে, সে খুব অসুবিধায় পড়বে। এ ব্যাপারে আমিও তার সাথে একমত যে, সে লোকটি অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু এটা আমার জন্য ভালো। আমি ৫ হাজার ডলার অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতির মাধ্যমে অর্জন করে নিতে পারি, তাহলে আমি একটি পাঁচতারা হোটেল ভালো ভালো খাবার খেতে পারবো।

খ. তুমিও ডাকাতির শিকার হতে পার

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, তুমিও অন্য কোনো ডাকাতের ডাকাতির শিকার হতে পারো। আমি বলবো, কেউ আমাকে তার ডাকাতির শিকার বানাতে পারে না। কারণ আমি অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। শত শত দেহরক্ষী আমাকে সার্বক্ষণিক ঘিরে

করে রাখে। আমি যে কোনো মানুষকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারি। কিন্তু কোনো ডাকাত আমাকে ডাকাতির শিকারে থামাতে পারে না। ডাকাতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশ হতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন প্রভাবশালী লোকের জন্য নয়।

গ. পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে

কেউ হয়তো বলবে যে, তুমি যদি ডাকাতি কর, তাহলে পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। আমি বলবো যে, পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে না। কারণ আমি পুলিশকে রীতিমত টাকা চাঁদা দিয়ে থাকি। আমি এতে একমত যে, একজন সাধারণ মানুষ ডাকাতি করলে সে শ্রীঘ্রই পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে যাবে। কিন্তু আমি একজন অত্যন্ত অসাধারণ শক্তিশালী অপরাধী। এটা আমার জন্য মন্দ হওয়ার পক্ষে কেউ আমাকে যুক্তিপূর্ণ একটি কারণ দেখাতে পারলে ও তাৎক্ষণিক আমি এটা ছেড়ে দিবো।

ঘ. এটা সহজে পাওয়া টাকা

কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, এটা সহজে পাওয়া টাকা। এটা শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত নয়। আমি বলবো যে, আমার ডাকাতি করার আসল কারণতো এটাই। কোনো মানুষের সামনে টাকা উপার্জনের যদি দুটো পথ থাকে—একটি সহজ পথ, অপরটি কঠিন পথ। তবে সে যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, সে সহজ পথটিই বেছে নেবে।

ঙ. এ কাজ মানবতা বিরোধী

এ যুক্তি ও কেউ দেখাতে পারে যে, এটা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য তৎপরতা। মানুষকে অপর মানুষের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি পাল্টা যুক্তি খাড়া করাবো যে, 'মানবতার' এ বিধান কে রচনা করেছে? তার বিধান আমি মানবো কেন?

এ আইন পদের জন্য ভালো হতে পারে, যারা আবেগপ্রবণ ও দুর্বলচিত্ত লোক। কিন্তু আমি একজন যৌক্তিক ও শক্তিশালী ব্যক্তি, তাদের জন্য, অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মধ্যে আমার কোনো কল্যাণ দেখি না।

চ. এটা একটা স্বার্থপর কাজ

কেউ কেউ এটাকে একটা স্বার্থপর কাজ বলতে পারে। আমি বলবো— এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটা একটা স্বার্থপর কাজ; কিন্তু আমি সার্থক কেন হবে না? এটাইতো আমাকে জীবনটাকে উপভোগ করতে সাহায্য করে। ডাকাতির কাজটা মন্দ হওয়ার যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

অতঃপর ডাকাতির কাজটাকে মন্দ বলে প্রমাণ করার পক্ষে উপস্থাপিত সকল যুক্তি প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে গেল। এসব যুক্তি প্রমাণ একজন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন যথেষ্ট শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কোনো যুক্তিই কেবল কার্যকর ও বির্তকের বলিষ্ঠতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পৃথিবী জুড়ে অনেক অপরাধী বিরাজমান।

একইভাবে আমার মতো লোকের জন্য নারী ধর্ষণ ও প্রতারণা প্রভৃতি কাজ খুব ভালো এবং এ কাজগুলো মন্দ হওয়ার পক্ষে এমন কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, যা উক্ত কাজগুলোকে মন্দ বলে আমাকে বোঝাতে সক্ষম।

২. একজন মুসলিম শক্তিমান ও প্রভাবশালী একজন অপরাধীকেও বোঝাতে সক্ষম

এবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধরুন আপনি বিশ্বখ্যাত একজন শক্তিশালী প্রভাবশালী অপরাধী। আপনি পুলিশ এমনকি মন্ত্রীকে পয়সা দিয়ে কিনে রেখেছেন। আপনার নিরাপত্তার জন্য রয়েছে একটা বিশাল অনুগত বাহিনী। আমি একজন মুসলিম। আমি আপনাকে বোঝাতে চাই যে, ডাকাতি ধর্ষণ প্রতারণা ইত্যাদি কাজগুলো অত্যন্ত মন্দ। এখন আমি যদি উপরিক্ত যুক্তিগুলো তার সামনে পেশ করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তা সে আগের মতোই উত্তর দেবে যেমনটা সে ইতোপূর্বে দিয়েছে। আমি তার সাথে একমত যে, সে যদি অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অপরাধী হয়, তবে তার যুক্তিগুলো যথার্থ সত্য।

৩. প্রত্যেকটি মানুষ সুবিচার চায়

মানুষ যদি অন্যের জন্যে সুবিচার না-ও চায় তবুও সে নিজের জন্য তা কামনা কর। কতেক লোক শক্তি ও প্রভাবের কারণে অবশ্যই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যদের দুঃখ কষ্টের কারণে পরিণত হয়। এ লোকেরাই আবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে, যখন তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হয়। কারণ এ ধরনের মানুষরা অন্যের দুঃখ কষ্টের প্রতি অনুভূতিহীন হয়ে থাকার কারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পূজা করে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সহায়তায় তারা যে অন্যের উপর অবিচার করতে সুযোগ পাচ্ছে, শুধু তা-ই নয়, ববং অন্যরা যেন তাদের প্রতি একই অন্যায় আচরণ দেখাতে না পারে, তা-ও তারা প্রতিরোধ করছে।

৪. 'আল্লাহ' সবচেয়ে শক্তিমান ও ন্যায়বিচার

একজন মুসলিম হিসেবে আমি অপরাধীকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে, আল্লাহ তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিমান এবং সাথে সাথে তিনি ন্যায়বিচার ও বটে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۔

অর্থ : "আল্লাহ কখনো বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না।" (সূরা নিসা : ৪০)

৫. আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

অপরাধী, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনা হবার কারণে তার সামনে আল কুরআনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যকে তার সামনে পেশ করার পর সে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপার একমত। এখন যে যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আল্লাহ যদি শক্তিমান ও ন্যায়বিচারক হয়ে থাকবেন, তাহলে তিনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

৬. যারা অন্যায়-অবিচার করে, তাদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক

আর্থিক বা সামাজিকভাবে যুলুমের শিকার প্রতিটি ব্যক্তিই চায় যে,যালিমের শাস্তি হোক। প্রতিটি সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা, ডাকাত প্রতারক ও ধর্ষণের উচিত শিক্ষা হোক। অসংখ্য অপরাধী যদি ধরা পড়ছে, তাদের মধ্যে কারো কারো শাস্তি হচ্ছে, কিন্তু আরো অনেক অপরাধী মুক্ত রয়েছে এবং তারা মানুষকে নির্যাতন করেই যাচ্ছে। যখন কোনো শক্তিশালী বা প্রভাবশালী কারো উপর তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী কারও দ্বারা অত্যাচার-অবিচার হয়, তখন এ অপরাধী লোকটিও তার উপর যুলুমকারী অপরাধীর শাস্তি দাবি করে।

৭. এ জীবন পরকালীন জীবনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

পরকালীন স্থায়ী জীবনে সফলতার সাথে প্রবেশের জন্য ইহকালীন জীবন একটি পরীক্ষা স্বরূপ। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۔

অর্থ : "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কর্মের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনি তো অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।" [সূরা মূল্‌ক : ২]

৮. শেষ বিচার দিনেই চূড়ান্ত ফয়সালা

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۔ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۔

অর্থ : "প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; আর তোমাদেরকে (তোমাদের কাজের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিন দিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে করতে দেওয়া হবে, সে-ই চূড়ান্ত সফলতা লাভ করলো। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।" [সূরা আলে ইমরান : ১৮৫]

শেষ বিচার দিনেই হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। কোনো ব্যক্তি যখন মরে যাবে তাকে পুনরায় শেষ বিচার দিনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সকল মানুষের সাথে। কোনো অপরাধী দুনিয়ার জীবনে তার অপকর্মের কিছু শাস্তি পেয়েও যেতে পারে। তবে চূড়ান্ত শাস্তি বা পুরুস্কার তাকে দেয়া হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তথা আখিরাতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো ডাকাত বা ধর্ষককে এ দুনিয়াতে শাস্তি না-ও দিতে পারেন; কিন্তু শেষে বিচারে দিনে তাকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদীহি করতে হবে এবং তাকে সেখানে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

৯. হিটলারকে মানবরচিত আইন কী শাস্তি দেবে?

হিটলার তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কালে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে পুড়িয়ে মেরেছে। পুলিশ যদি তখন তাকে আটক করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানব রচিত আইন ন্যায়বিচার করে তাকে কি শাস্তি দিতে পারতো? বড়জোর তাকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এতে হয়তো একজন ইহুদিকে হত্যার প্রতিবিধান হতো, কিন্তু বাকি ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জন ইহুদিকে হত্যার বিচার কারা সম্ভব হতো কীভাবে?

১০. আখিরাতে হিটলারকে জাহান্নামে ফেলে ৬০ লক্ষ বারের চেয়ে বেশি বারে জ্বালানো আল্লার পক্ষেই সম্ভব

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

অর্থ : "নিশ্চয় যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আগুনে জ্বালাবো; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাবে, তখনই আমি তাদের চামড়া পাল্টে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।" [সূরা নিসা : ৫৬]

আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি আখিরাতে হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার জাহান্নামে পুড়ে মরার স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন।

১১. আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মানবিক মূল্যবোধ ও ভালো-মন্দের ধারণার কেনো দাম নেই

এখন প্রমাণিত হলো যে, কোনো ব্যক্তিকে আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থাশীল করা ছাড়া তার মানবিক মূল্যবোধ ও কুফল সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা যারা অর্থহীন-বিশেষ করে সে যদি হয় একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও শক্তিশালী অত্যাচারী ব্যক্তি।

১৭. দলে-উপদলে মুসলমানদের বিভক্তি প্রথা তাদের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য

প্রশ্ন : সকল মুসলমান যখন একই আল্লাহর কিতাব 'আল কুরআন মেনে চলে, তাহলে তাদের মধ্যে এত উপদেশ কেন? তাদের চিন্তা-চেতনায় এতো পার্থক্য কেন?

উত্তর : ১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত

এটা সত্য যে আজকের মুসলমানরা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ বিভক্তি ইসলামে মোটেই অনুমোদিত নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের নিরেট ঐক্যে বিশ্বাসী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলে—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ : "তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা।" [সূরা আলে ইমরান : ১০৩]

আল্লাহ সেই তাঁর রুজুটি কি যাকে আঁকড়ে ধরার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তা হলো আল কুরআন। আল কুরআনই হলো আল্লাহর সেই রুজ্জু বা রশি যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল মুসলমানের আঁকড়ে ধরা উচিত। আয়াতে দ্বিগুণ জোর দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে—

'ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো।' আবার বলা হয়েছে 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে—

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ

অর্থ : "তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের [সূরা নিসা : ৫৯]

অতএব মুসলমানদের আল কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণ করা উচিত এবং পরস্পর মতপার্থক্য করা উচিত নয়।

২. ইসলামে দলাদলী ও বিভক্তি নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করতো।" [সূরা আন্‌আম : ১৫৯]

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন যে, যারা নিজেদের দ্বীনকে ভাগ করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু যখন একজন মুসলিম প্রশ্ন করতে বসে, আপনি কে? তখন আমাদের একটি সাধারণ উত্তর হলো, 'আমি একজন সুন্নী' অথবা' আমি একজন শীয়া' অনেকে তাদের নিজেদেরকে' হানাফী' অথবা' শাফেয়ী' অথবা 'মালেকী' অথবা 'হাম্বলী' বলে পরিচয় দেয়। আবার অনেকে বলে, 'আমি একজন দেওবন্দি' আর কেউ কেউ বলে 'আমি একজন বেরলভী'।

৩. আমাদের নবী ছিলেন একজন মুসলিম মাত্র

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'আমাদের প্রিয়নবী (সা) কি ছিলেন? তিনি কি 'হানাফী' ছিলেন না-কি 'শাফেয়ী' না-কি 'মালেকী না-কি 'হাম্বালী'-এর উত্তর হলো 'না, তিনি পূর্বে আগত নবী-রাসুলদের মতোই একজন মুসলিম ছিলেন। আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ - قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ - اٰمَنَّا بِاللّٰهِ - وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

ঈসা (আ) ও তার অনুসারীরা মুসলিম ছিলেন। উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টান কোনটাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম।

৪. আল কুরআন নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে বলে

ক. কেউ যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?' তখন উত্তরে তার বলা উচিত যে, 'আমি একজন মুসলিম—'হানাফী' ও নয়, শাফেয়ী-ও নয়।

আল্লাহ বলেন—

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا -

অর্থ : "আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকাজে করে। আর বলে, আমিতো একজন 'মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী।" [আল কুরআন ৪১ : ৩৩]

খ. নবী (সা) অনুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন। সেসব চিঠিতে তিনি সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছিলেন—

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

অর্থ : "আপনি বলে দিন, 'হে আহলে কিতাব! এসো সে কথার দিকে, যা আমাদেরও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন তাহলো, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি। কোনো কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি। আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকে। আমরা মুসলমান।" [সূরা আলে ইমরান : ৬৪]

৫. ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান

আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান আলেমদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে, যাদের মধ্যে রয়েছে চার ইমাম : যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী,

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং মালিক (রা) আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন] তাঁরা ছিলেন ইসলামের জ্ঞানে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন। সর্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ ইমাম চতুদষ্টরের মধ্যে কারো অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু 'তুমি কে? এ প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হবে যে, আমি একজন মুসলিম।

কেউ কেউ সুনানে আবু দাউদের ৪ ৫ ৭ ৯ নং হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ বিভক্তির কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।"

হাদীসটির মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মতের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়বে, এমনকি তারা ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি একথা বলেন নি যে, তাঁতে উম্মতকে ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদ আমাদেরকে দল-উপদল সৃষ্টি করতে আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মেনে চলে এবং দল-উপদল সৃষ্টি করে না, তারাই সঠিক সত্য পথে আছে।

তিরমিযীর ১৭১ নং হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এবং একটি দল ছাড়া বাকি সব দলই জাহান্নামে যাবে।" সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি হবে? তিনি উত্তরে বললেন, "সেই দলটি হবে যার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম থাকবে।"

কুরআন মাজীদের বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসুলের" একজন খাঁটি মুসলমানের উচিত হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁতে রাসূলের সহীহ হাদীসসমূহের নির্দেশ মেনে চলা। সে যে কোনো ইসলামি বিশষজ্ঞের মত অনুসরণ করতে পারে, যদি সে বিশেষজ্ঞ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তাঁর মত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘঠিক হয়, তাহলে তার মতের কোনো মূল্যই নেই— এতে সে যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন।

যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে পড়ে এবং সেই মূলনীতি অনুসারে রাসূলের হাদীসকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে এবং আমরা সকলেই একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে উঠবো।

১৮. সকল ধর্মই মানুষকে সত্য ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তাহলে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে কেন?

প্রশ্ন : মৌলিকভাবে সব ধর্মই তার অনুসারীদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে একজন লোককে শুধুমাত্র ইসলামকে অনুসরণ করে চলতে হবে কেন? সে কি অন্য কোনো ধর্ম মেনে চলতে পারে না?

উত্তর : ১. ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

সব ধর্মই মানুষকে মন্দ থেকে বেঁচে থেকে সৎপথে চলার পরামর্শ দেয়। তবে ইসলামে এর বাইরে কিছু রয়েছে। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায় ও সত্যকে পাওয়ার জন্য এবং মন্দের দূর করার জন্য আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে সামষ্টিক জীবনে ব্যবহারিক পন্থা অনুসরণ করার দিকনির্দেশনা দেয়। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও তার সমাজের জটিলতাকে বিবেচনায় রাখে। ইসলাম হলো স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশ। সুতরাং ইসলামকে দ্বীনুল ফিতরাহ' তথা মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা' বলা হয়।

২. উদাহরণ— যেমন ইসলাম আমাদের ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করতে নির্দেশ দেয়, সাথে সাথে ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করার পদ্ধতি ও বাতলে দেয়।

ক. ইসলাম ডাকাতি ও রাহাজানি নির্মূল করার পদ্ধতি বাতলে দেয়

সব কটি প্রধান ধর্মই চুরি ও ডাকাতিকে একটি মন্দ কাজ বলেই শিক্ষা দিয়ে থাকে; ইসলামও একই শিক্ষা দেয়। সুতরাং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সত্যি বলতে কি ইসলাম 'চুরি-ডাকাতি একটি মন্দ কাজ এ শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে এমন একটি সমাজ গড়ার ব্যবহারিক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়, যেখানে মানুষ চুরি-ডাকাতি করবে না।

খ. ইসলাম যাকাতের বিধান দেয়

ইসলাম যাকাতের বিধান বাস্তবায়নের নির্দেশ দান করে। এটি বাধ্যতামূলক বার্ষিক একটি দান বিশেষ। ইসলামি আইনের বিধান হলো। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ 'নিসাব' পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অথবা ৫২ ত(১,২) তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে, তাকে প্রতি চান্দ্র বছরে বাধ্যতামূলকভাবে তার সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ বিধান অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি ধনী লোক যথাযথভাবে হিসেব করে যাকাত দেয়,তাহলে সমগ্র বিশ্ব থেকে দারিদ্র নির্মূল হয় যাবে। এর ফলে পৃথিবীতে একটি মানুষও অনাহারে মারা যাবে না।

গ. চুরি-ডাকাতির শাস্তির বিধান হলো হাত কেটে দেওয়া

ইসলাম চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার জন্য চোর-ডাকাতের হাত কেটে দেওয়ার বিধান পেশ করে। কুরআন মাজীদের সূরা আল মায়েদায় আল্লাহ বলেন—

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ : "আর তোমরা চোর বা চুরনীর হাত কেটে দাও, তারা যা করেছে তার শাস্তি এটাই। তাদের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আল্লাহ পকষ থেকে : আর আল্লাহ পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ।" [আল কুরআন ৫ : ৩৮]

অমুসলিমরা বলতে পারে যে, "এ বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটা— ইসলাম একটি বর্বর ও নিষ্ঠুর ধর্ম।"

গ. ইসলামী শরীআহ আইন বাস্তবায়িত হলেই এর সুফল পাওয়া যাবে

ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত একটি রাষ্ট্র। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক হারে অপরাধ সংঘটিত হয় চুরি-ডাকাতি। মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামী শরীআহ আইন জারী করা হলো। উদাহরণ স্বরূপ, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত (সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের উপরে চন্দ্র বার্ষিক বাধ্যতামূলক দান) দেয় এবং প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ মহিলার হাত কেটে দেওয়া হয়, তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে। এখন বলুন, অতঃপর আমেরিকাতে চুরি-ডাকাতি বাড়বে না-কি একই থাকবে অথবা কমে যাবে? স্বভাব এটা কমে যাবে। এ ধরনের কঠিন আইন জারী থাকলে অনেক স্বভাবগত অপরাধী নিজেকে ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্টা হবে। ফলে ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় চোরও নিজেকে সংশোধন কর নেবে এবং চুরিও ডাকাতী নিজেকে নির্মুল হয়ে যাবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বিশ্বে চোর-ডাকাতের যে বিশাল সংখ্যা রয়েছে তাতে যদি তাদের হাত কাটা হয় তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের হাত কাটা। তবে ব্যাপারটা হলো– যখনই হাত কাটার বিধান জারী হবে, তার পর মুহূর্ত থেকেই চুরি-ডাকাতির সংখ্যা কমে যাবে। পেশাধারী চোর ও এ পথে পা বাড়াবার আগে একবার পরিণতির কথা ভেবে দেখবে যে, ধরা পড়লে তার পরিণতি কেমন হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই অধিকাংশ চোর-ডাকাতের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া এ পেশায় কেউ টিকে থাকবে না।

অতএব একান্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের হাত-ই শুধু কাটা যাবে। ফলে কোটি কোটি লোক চুরি-ডাকাতির ভয় থেকে নিরাপত্তা পেয়ে শান্তিতে বাস করবে। আর চুরি-ডাকতি বন্ধ হওয়ার ফলে অনেক চোরের হাত-ই কাটা যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

অতএব ইসলামী আইন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ।

৩. উদাহরণ : ইসলাম উৎপীড়ন ও ধর্ষণের মত জঘন্য কাজকে নিষিদ্ধ করেছে। 'হিজাব' বা পর্দাকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং প্রমাণিত ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যু দন্ডের বিধান দিয়েছে :

ক. নারী উৎপীড়ন ও ধর্ষণ নিমূল করার পদ্ধতি দিয়েছে ইসলাম

সব কটি প্রধান ধর্মই নারী-উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো— ইসলাম নারীদের মর্যাদা রক্ষার উপদেশ দিয়েই এবং নারীদেরকে উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েই থেমে থাকে না; বরং সমাজ থেকে এ জঘন্য অপরাধ যাতে নির্মূল হয়ে যায় তার পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

খ. পুরুষের জন্য পর্দা

ইসলামে রয়েছে পর্দার বিধান। ইসলাম প্রথমে পুরুষের জন্য পর্দার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর ঘোষণা করেছে নারীর পর্দার কথা। নিম্নোক্ত আয়াতে পুরুষের পর্দার কথা ঘোষিত হয়েছে —

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থ : "আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" [আল কুরআন ২৪ : ৩০]

পুরুষের দৃষ্টি নারীর প্রতি পড়লে যদি তার মনে কোনো অশ্লীল ও লজ্জাকর চিন্তা এসে যায়, তাই তাৎক্ষণিক তার দৃষ্টি নামিয়ে নেওয়া উচিত।

গ. নারীর জন্য পর্দা

এ আয়াতে নারীর পর্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে —

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ .....

অর্থ : "আর আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর তারা যেন সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর তারা যেন তাদের চাঁদর স্বীয় বুকের উপর জড়িয়ে রাখে; আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে এদের ছাড়া— তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র...।'[আল কুরআন ২৪ : ৩১]

নারীর জন্য বর্ধিত 'হিজাব' তথা পর্দা হলো তার পুরো শরীর (ঢিলে ঢালা) পোশাক দ্বারা ঢাকা থাকতে হবে কেবল মুখমণ্ডল কব্জী পর্যন্ত দু হাত, তবে তারা যদি চায় তা-ও ঢেকে নিতে পারে। তবে ইসলামি আইনের কতেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মুখমন্ডল ঢাকার উপর জোর দিয়েছেন।

ঘ. 'হিজাব' নারীকে উৎপীড়ন থেকে বাঁচায়

আল্লাহ তাআলা নারীর জন্য পর্দার বিধান কেন দিয়েছেন– তার কারণ সূরা আহযাবের নিচের আয়াতে উল্লেখ করেছেন —

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন। তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিত হবে না; আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" [সূরা আহযাব : ৫৯]

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলে যে, নারীর জন্য 'হিজাব' এর বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। এটা তাদেরকে উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

ঙ. যমজ দু বোনের উদাহরণ

ধরা যাক, দু বোন যমজ এবং তারা উভয়েই সুন্দরী; তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামী 'হিজাব' বা পর্দাবৃতা অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা। অন্য যমজ বোনটি মিনিস্কার্ট বা সর্টস (সংক্ষিপ্ত পোশাক) পরিহিতা। রাস্তার ফাঁকে এক বখাটে যুবক যে, কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। বলুন তো, বখাটে যুবকটি কোন্ মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামী 'হিজাব' ঢাকা তাকে, না-কি যে মেয়েটি মিনি স্কার্ট বা সর্টস্ পরা তাকে? পোশাক-ই তা প্রকাশ করে যা, তারা গোপন করতে চায় এং এর দ্বারাই বিপরীত লিঙ্গকে উত্যক্ত করা ও ধর্ষণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ সঠিক বলেছে যে, পর্দা নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

চ. ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি

ইসলামী শরীঅহ প্রমাণিত ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আধুনিক যুগে এ ধরনের কঠোর শাস্তির কথা শুনে অমুসলিমরা ভীত হয়ে পড়তে পারে। অনেকে ইসলামকে নিষ্ঠুর বর্বতার দোষে দোষারোপ করতে পারে। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষকে একটি প্রশ্ন করেছি। ধরা যাক, আল্লাহ ক্ষমা করুন, কোনো নরাধম আপনার স্ত্রী, মাতা এবং কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে উপরিস্টক ধর্ষককে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন? প্রশ্নকৃত সবাই বলেছে যে, 'আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।' কিছু লোকতো এমন বলেছে যে, 'আমরা তাকে এমন তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো।' এখন প্রশ্ন হলো, আপনি আপনার স্ত্রী, মাতা ও কন্যার ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু অপর কারো স্ত্রী, মাতা কন্যার ধর্ষকের জন্য নির্ধারিত শাস্ত্রীকে আপনি বর্বরতা বলে বেড়াবেন– এমন দ্বিমুখী ভূমিকা কেন?

ছ. আমেরিকায় ধর্ষণের রেকর্ড সর্বোচ্চ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। ১৯৯০ সালের একটি এফ, বি, আই-এর ফেডারেল ব্যুরো অব ইনটেলিজেন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সে দেশে উক্ত বছরে ১,০২,৫৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ধর্ষণের সঠিক

সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য নথিভুক্ত সংখ্যাকে ৬. ২৫ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৬.৪০, ৯৬৮। এটা হলো আমেরিকায় ১৯৯০ সালে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা। মোট সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই ১,৭৫৬ যা সেই দেশে দৈনিক গড়ে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা।

পরবর্তী অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অব জ্যাস্টিস স্ট্যাপটিসটিক্স (ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)-এর পরিসংখ্যান অনুসারে শুধু ১৯৯৬ সালেই ৩,০৭,০০০ ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ঘটনার সর্বোচ্চ ৩১% ঘটনা অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে। বাকি ঘটনার অভিযোগ না করে নিরব থাকা হয়। অতএব ৩.০৭০০০× ৩.২২৬ = ৯.৯০,৩২২টি ধর্ষণের ঘটনা ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে সংঘটিত হয়েছে। তাহলে ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯,৯০,৩২২ ÷ ৩৬৫ = ২,৭১৩টি। উক্ত বছরে প্রতি ৩২ সেকেন্ডে সেখানে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা, সেখানে সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত আমেরিকান ধর্ষকেরা ক্রমান্বয় সাহসী হয়ে উঠছে। এফ.বি.আই-এর ১৯৯০ সালের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, নথিভুক্ত ঘটনায় ১০% ধর্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ষণের ঘটনার মোট সংখ্যাক মাত্র ১.৬% ধর্ষকের শাস্তি হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের ৫০% অপরাধী বিচার কর্ম শুরু হওয়ার আগেই ছাড়া পেয়ে যায়। এতে করে গ্রেফতারকৃতদের কেবল ০.৮% অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়। অন্য কথায় যদি কোনো অপরাধী যদি ১২৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাহলে তার সাজা পাবার আশঙ্কা মাত্র একটি ঘটনার। অনেক ধর্ষক এটাকে একটা নিশ্চিন্ত বাজী ও জুয়ার মতো ধরে নিতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, যেসব অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়, তাদের ৫০% এর শাস্তি হয় এক বছরেরও কম সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। যদিও আমেরিকার আইনে ধর্ষণের শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকার বিচারকরা প্রথমবার ধর্ষকের প্রতি নমনীয় রায় দেন। চিন্তা করে দেখুন, কোনো ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের পর মাত্র একবার সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং ৫০% ধর্ষকের প্রতি বিচারকরা নমনীয় রায় দেন অর্থাৎ ১ বছরের কম সময়ের কারাদণ্ড দেন।

জ. ইসলামী শরীআহ আইন জারী হলে এর সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে

মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামী আইন জারি হয়েছে। কোনো পুরুষের দৃষ্টি কোনো নারীর প্রতি পড়লে সে তার মনে কোনো কুচিন্তা আসার আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গেই

তার দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে। নারীরা ইসলামী 'হিজাব'-এর বিধান মেনে চলছে অর্থাৎ মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে চলাফেরা করছে। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাকে চরম শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় কোনো মতেই ধর্ষণের অপরাধ বাড়তে তো পারেই না; এমনকি স্থিরও থাকতে পারে না; বরং এ অপরাধ কমতে বাধ্য।

৪. ইসলাম মানবীয় সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান দেয়

ইসলাম মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। কারণ এর বিধানসমূহ কেবল তত্ত্বগত বুলি নয়; বরং তা হচ্ছে মানব সন্তানদের এক বাস্তবমুখী কল্যাণধর্মী বিধান। ইসলামের বিধানসমূহ যেমন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর, তেমনি সামষ্টি পর্যায়েও এ বিধানসমূহ অনন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা, কারণ এটা সবচেয়ে বাস্তবমুখী, বিশ্বজনীন ব্যবস্থা, যা বিশেষ কোনো জাতি গোষ্ঠির জন্য নির্ধারিত নয়।

১৯. ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অনুশীলনের মধ্যে অনেক পার্থক্য

প্রশ্ন : ইসলাম যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত অসৎ অবিশ্বাস, অনির্ভর যোগ্য লোক কেন? আর কেনই বা তারা প্রতারণা ভ্রান্ত আসক্তি ইত্যাদি অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত?

উত্তর : ১. প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচার

ক. ইসলাম নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম; তবে প্রচার মাধ্যমগুলো পাশ্চাত্য বাসীদের হাতে। যারা ইসলামকে ভয় পায়। এসব প্রচার মাধ্যম অনবরত ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভুল তথ্যবলী প্রচার করে যাচ্ছে। ছেপে চলছে মিথ্যা তত্ত্বও তথ্যবলি। অথবা তারা আংশিক সত্যকে পুরোপুরি সত্যে পরিণত করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

খ. পৃথিবীর কোথাও কোনো বোমা বিস্ফোরিত হলে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই পশ্চিমারা সর্বপ্রথম সেটাকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রচারণা শুরু করে দেয়। পত্র-পত্রিকায় এটাকেই ব্যনার হেডিং করে ছেপে দেয়। পরবর্তীতে যদি প্রমাণিত হয় যে, এ বিস্ফোরণের জন্য কোনো অমুসলিম দায়ি, তখন এটাকে গুরুত্বহীনভাবে পরিত্যাগ করে।

গ. ৫০ বছর বয়স্ক কোনো মুসলমান যদি ১৫ বছর বয়সের কোনো মেয়েকে তার সম্মতিতেই বিয়ে করে, তখন এটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপার মতো একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আর ৫০ বছর বয়স্ক কোনো অমুসলিম যদি ৬ বছরের কোনো

বালিকাকে ধর্ষণ করে, তখন এটা পত্রিকার ভেতরের পাতায় সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ-এর কলামে ছাপা হয়। আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে; কিন্তু এসব ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। যেহেতু এসব ঘটনাইতো আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ।

২. লঙ্কারও ভিখেরি আছে

আমি ভালো করেই জানি যে, কতেক মুসলমান অসৎ, অনির্ভরযোগ্য যারা প্রতারণা ইত্যাদি অপকর্মের সাথে জড়িত। কিন্তু প্রচারে মাধ্যমগুলো এটাকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে, শুধু মুসলমানরাই এসব অপকর্মের সাথে জড়িত। প্রত্যেক সমাজেই অসৎ লোক আছে এবং থাকবে। আমি জানি, মুসলিম সমাজেও মদপায়ী লোক আছে ও থাকবে। কিন্তু যারা মদপায়ী এবং তৎসঙ্গের অন্য অনেক অপকর্মের সাথে জড়িত, তাদের অধিকাংশই অমুসলিম।

৩. সামগ্রিকভাবে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ

মুসলিম সমাজে কিছু কিছু অসৎ লোকের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এবং মুসলিম সমাজ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সামগ্রিকভাবে আমরাই বৃহত্তম মাদকাসক্তি থেকে সর্ববৃহৎ সমাজ। আমরাই সামাজিকভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে দান দক্ষিণা করে থাকি। নৈতিকতা সংযম সহনশীল, পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নে এখনও মুসলমানরাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫. গাড়ির চালক দিয়ে গাড়ির বিচার করবেন না

আপনি যদি কোনো গাড়ি সম্পর্কে তা কতটুকু ভালো বা মন্দ, তা জানতে চান, তাহলে ড্রাইভিং সীটে এমন একজন এক্সপার্ট ড্রাইভারকে বসাতে হবে যে গাড়ি সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথের জ্ঞান রাখেন। একইভাবে ইসলামকে জগতে হবে তার সঠিক বাস্তবায়নকারী ও যথার্থ অনুসারী আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (সা) থেকে। বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ ছাড়াও অমুসলিম নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ রয়েছেন, যারা পক্ষপাতহীনভাবে দাবি করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা) ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম মানুষ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ. হার্ট যিনি 'The Hurdred most Influential in menin History' (মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী একশত ব্যক্তির নামক বইয়ের রচয়িতা। তিনি মুহাম্মদ (স)-কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রিয় নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তালিকার প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া থমাস কার্লাইন ও লা-মাটিন এবং আরোও অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক। নিরপেক্ষ বিচারে মুহাম্মদ (সা)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন।

২০. অমুসলিমদের 'কাফির' বলা

প্রশ্ন : মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করে কেন?

উত্তর : ১. 'কাফির' অর্থ অস্বীকারকারী

'কাফির' শব্দটি' কুফর' শব্দ থেকে উদ্ভুত। শব্দটির অভিধানিক অর্থ 'গোপন করা' অস্বীকার করা। বা প্রত্যাথ্যান করা। ইসলামের পরিভাষায় 'কার্যকর' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ইসলামের সত্যকে গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজিতে যাকে আমরা নন-মুসলিম' বলে থাকি।

২. অমুসলিমরা এতে মনোকষ্ট পেলে তাদের উচিত ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়া

কোনো 'অমুসলিম' যদি 'কাফির তথা 'নন-মুসলিম' শব্দটিকে 'গালি' মনে করে তবে তার উচিত ইসলাম গ্রহণ করে 'মুসলিম' জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। আর তখনই কেবল মাত্র আমরা তাকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবো। নচেৎ যতদিন সে ইসলামের বাইরে থাকবে, ততদিন তাকে 'কাফির' তথা' অমুসলিম বলা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

সমাপ্ত